হিন্দু সংহতি

স্বদেশ সংহতি সংবাদ

সাহস ✪ শক্তি ✪ সক্রিয়তা

বিশেষ পূজা সংখ্যা ২০১৮ (আশ্বিন, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ)

সম্পাদক
সমীর গুহরায়

প্রকাশক ও মুদ্রক
শ্রী চিত্তরঞ্জন দে

সম্পাদকীয় কার্যালয়
৫, ভুবন ধর লেন, কলকাতা-৭০০০১২
ফোন ঃ ৭৪০৭৮১৮৬৮৬

মুদ্রণে
মহামায়া প্রেস এন্ড বাইন্ডিং
২৩, মদন মিত্র লেন, কলকাতা-৭০০০০৬
ফোন ঃ ০৩৩ ২৩৬০ ৪৩০৬

প্রাপ্তিস্থান
বিবেকানন্দ সাহিত্য কেন্দ্র
৬, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য-২০ টাকা

ইন্টারনেটে হিন্দুসংহতি
<www.hindusamhati.net>,
<hindusamhatibangla.com>
<www.hindusamhatitv.blogspot.in>,
Email : hindusamhati@gmail.com

সূচীপত্র

আমাদের কথা		২
আমাদের হিন্দু রাষ্ট্র চাই, হিন্দু রাজ্য চাই এবং ভারতে হিন্দু শাসন চাই	তপন ঘোষ	৩
ধর্মনিরপেক্ষতা	অমিত মালী	৯
খ্রিষ্ট দুষ্ট	দুর্গেশনন্দিনী	১২
আয়ুধ	সোমা চন্দ	১৯
শিশির ভেজা পদ্ম	পিনাকি	২৫
আগমনী	শেখর ভারতীয়	৩৪
মেঘ রোদ্দুর	ঝুর্মা বর্মন	৩৬
প্রতিশোধ	অম্বিকা গুহরায়	৪০
১৯ শতকের একটি কিংবদন্তী অনুসারে		৪২
দিগন্তরেখা	সমীর গুহরায়	৪৩
বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত		৪৭
শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রতিবাদ		৪৮

কবিতা

আজকের সরস্বতী	মিতালী মুখার্জী	৪৫
মা	মমতা ভট্টাচার্য্য	৪৫
অসুরনাশী	দেব চট্টোপাধ্যায়	৪৬
মানানসই	মীনাক্ষী দাস	৪৬

আমাদের কথা

অকালবোধনের উদ্দেশ্য

অকাল বোধন। ত্রেতাযুগে অযোধ্যার রাজকুলের (রঘুবংশ) কুলতিলক রামচন্দ্র প্রথা ভেঙে দেবী দুর্গার আরাধনা করলেন। অকালে দেবী মা-র আবাহন, তাই আকাল বোধন। কিন্তু কেন তিনি অকালে দেবী দুর্গার পূজা করলেন? কারণ প্রবল, পরাক্রান্ত ও শক্তিশালী রাবণকে যুদ্ধে পরাজিত করতে 'শক্তিরূপিণী' মায়ের আশীর্বাদ একান্ত প্রয়োজন ছিল। যে শক্তির কাছে মহিষাসুর পরাভূত, যে শক্তির কাছে 'রক্তবীজ'-এর মতো শক্তিশালী অসুর পরাজিত; সেই শক্তিকে আশীর্বাদ রূপে ধারণ করতে চেয়েছিলেন রামচন্দ্র।

দুর্গাপূজা হল শক্তির আরাধনা, শান্তির নয়। শান্তির বার্তা নিয়ে রামচন্দ্র অঙ্গদকে রাবণের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোন লাভ হয়নি। পরবর্তীকালে পাণ্ডবরাও শান্তির বাণী নিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের কাছে পাঠিয়েছিলেন, কোন লাভ হয়নি। কারণ আসুরিক শক্তির কাছে তো 'শান্তির ললিতবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।' তাই যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। যুদ্ধ ছিল শান্তির বার্তাবহ। স্বাভিমান রক্ষার্থে (সীতাদেবী ছিলেন রামচন্দ্র ও অযোধ্যার স্বাভিমান) রামচন্দ্র লঙ্কার মাটি রক্তে ভাসিয়ে দিলেন। কিন্তু এতে তাঁর কঠিন হৃদয় (অথচ তিনি দয়ার অবতার রূপে চিহ্নিত) বিচলিত হল না। একইভাবে কুরুক্ষেত্রের মাটিও তাজা খুনে লাল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের হৃদয়ে হাজার হাজার মানুষের মৃত্যুতেও অনুকম্পন সৃষ্টি হল না। আসলে আসুরিক শক্তি কেবল প্রবল শক্তির কাছেই মাথা নত করে। তাই যুদ্ধ ছিল অপরিহার্য।

সময় বদলেছে। অত্যাধুনিক যুগে নবরূপে আবির্ভূত কলিযুগের অসুর। আসুরিক শক্তি মাথা চারা দিয়ে উঠে বঙ্গদেশ (পশ্চিমবঙ্গ) গ্রাস করতে চাইছে। আর এই সঙ্কটকালে অকাল বোধন করে বাঙালী দেবী দুর্গার কাছে কী চাইছে? 'শান্তির ললিত বাণী।' হায় রে মূর্খ হিন্দু বাঙালী! অসুররা কি বিনা যুদ্ধে সূচাগ্র মেদিনী-ও ছেড়ে দেবে, না দিয়েছে। তাই শান্তি না চেয়ে শক্তি চাওয়াই কি দেবী মা-র কাছে আমাদের একান্ত কাম্য নয়! আসুন, সকলে মিলে সেই শক্তির আরাধনা করি। অস্ত্রসাজে সজ্জিত দেবী দুর্গার কাছে অস্ত্র প্রার্থনা করি। আর সকলে সমবেতভাবে বলি-

যুদ্ধং দেহি যশং দেহি, শক্তিরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমঃ নমঃ।

আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র চাই, হিন্দু রাজ্য চাই এবং ভারতে হিন্দু শাসন চাই

তপন ঘোষ

ভারতের স্বাধীনতার পর ৭০ বছর অতিক্রান্ত। এই দীর্ঘ সময় ধরে ভারতবর্ষ একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে থেকেছে। আর ভারতের হিন্দু জনগণ এটাকে মেনে নিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে কেন ভারতের ধনী-গরিব থেকে শুরু করে অতি সাধারণ হিন্দু জনগণের এটা মনে হচ্ছে যে আর আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা চাই না, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র চাই না? বর্তমানে এটা বাস্তব সত্য যে ভারতের বিশাল সংখ্যক সাধারণ হিন্দু জনগণ ভারতকে হিন্দুরাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চাইছে। কিন্তু কারণটা কি?

আমি আপনাদের অমরনাথ যাত্রার কথা বলবো। কিছু বছর আগেকার কথা। আপনারা সকলেই জানেন যে, কাশ্মীরে অবস্থিত অমরনাথ মন্দিরে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ হিন্দু তীর্থ করতে যান। এই অমরনাথ যাত্রা যথেষ্ট কষ্টকর কারণ তীর্থযাত্রীদের অনেক দুর্গম পাহাড়ি পথ পায়ে হেঁটে পেরোতে হয়। তাই জম্মু-কাশ্মীরের সরকার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্যে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে, যারা অমরনাথ তীর্থ যাত্রার দেখাশোনা করে, যার প্রধান জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল, ১০০ একর জমি দেবার ঘোষণা করে। এই জমিতে অমরনাথ মন্দিরে আসা হিন্দু তীর্থযাত্রীদের থাকার জন্যে অস্থায়ী ছাউনি, টয়লেট ইত্যাদি বানানোর পরিকল্পনা করেছিল অমরনাথ শ্রাইন বোর্ড। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ দেশ হওয়া সত্ত্বেও কি হলো? সরকারের এই ঘোষণার বিরুদ্ধে কাশ্মীরের ৬ জেলার সমস্ত মুসলমান রাস্তায় নেমে এই ১০০ একর জমি দেবার বিরোধিতা করতে লাগলো এবং সরকারের এই ঘোষণা মানব না, এটা কেন্দ্র সরকারের কাশ্মীরের জনবিন্যাস বদলে দেবার চক্রান্ত বলে অভিযোগ করল। আমরা কোনোমতেই অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে জমি দিতে দেব না। এই আন্দোলন এতটাই তীব্রতর ছিল যে, সেনাবাহিনীর অনেক জওয়ান এবং পুলিশকর্মীর মৃত্যু হয় এই আন্দোলনে। তাহলে আপনারা ভেবে দেখুন, মাত্র ১০০ একর জমি দেওয়াতেই যদি মুসলমানরা মনে করে যে জনবিন্যাস বদলে যাবে, তাহলে যখন ধর্মের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল মুসলমানদে দাবি মেনে মুসলিমদের জন্যে পাকিস্তান তৈরি হবার পরেও কেন ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে? জনবিন্যাসের এই পরিবর্তন হিন্দুরা কেন মেনে নেবে? উদাহরণ আমাদের চোখের সামনে। পশ্চিমবঙ্গের তিনটি জেলা মুর্শিদাবাদ, মালদা এবং উত্তর দিনাজপুর জেলাতে হিন্দু সংখ্যালঘুতে পরিণত। আসামের সাতটি জেলা---ধুবড়ি, বরপেটা, গোয়ালপাড়া, নগাঁও, মরিগাঁও, হাইলাকান্দি এবং করিমগঞ্জ-এ হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত। ঝাড়খণ্ডের মতো অধিবাসী জনজাতি অধ্যুষিত রাজ্যের তিনটি জেলা পাকুড়, সাহেবগঞ্জ এবং গোড্ডাতে হিন্দুরা সংখ্যালঘু; আর রাজমহল জেলাতেও হিন্দুরা সংখ্যালঘু হবার পথে। তাহলে কি দেখছি? মুসলিমদের জন্যে আস্ত একটা রাষ্ট্র দেবার পরেও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে হিন্দু জনসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে কমছে, হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে হিন্দুরা প্রতিবাদ জানাবে না? ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে? কেন হিন্দুরা আওয়াজ তুলে বলবে না যে এতগুলি জায়গাতে যদি হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের জন্যে বিপদের দিন আসছে? আর অনেক হিন্দু সব জেনেও এই ভয়ে প্রতিবাদ করে না, যদি প্রতিবাদ করি, তাহলে গায়ে সাম্প্রদায়িক লেবেল সেঁটে দেওয়া হয়। আমরা কি ভুলে গিয়েছি, ১৯৪৭ সালে শুধু এই সেক্যুলারিজম বজায় রাখতে গিয়ে আমরা আমাদের জন্মভূমিকে ভাগ করে মুসলমানের হাতে তুলে দিয়েছি? তখন এই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ভেবে আন্দোলন, লড়াই না করে চুপ করে থেকেছি। কিন্তু এ কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, যেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠরা অত্যাচারিত হয়, তাদের মন্দির লুণ্ঠিত হয়, অপবিত্র হয়, পরিবারের মেয়েদের ধর্মান্তরিত হতে হয়; কিন্তু কিছু করার থাকে না?

এ কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, যা বজায় রাখতে গিয়ে আমরাই এই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ব্লকে সংখ্যালঘুতে পরিণত হচ্ছি? আমি দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার মগরাহাট ব্লকের কথা বলতে চাই। ওই ব্লকে মাত্র ২০ বছরে (১৯৮১-২০০১) হিন্দু জনসংখ্যা ৮৭ শতাংশ থেকে কমে ৪৭ শতাংশে পরিণত হয়ে গিয়েছে। আর ওই ২০ বছরে মুসলিম জনসংখ্যা ১১ শতাংশ থেকে বেড়ে ৫১ শতাংশে পরিণত। কারণটা খুব পরিষ্কার।

ওই ব্লকে হাজার হাজার হিন্দু মেয়েকে লাভ জিহাদের ফাঁদে ফেলে ধর্মান্তরিত করা হয়েছে, মুসলিমদের আক্রমণে অনেক হিন্দু বাড়ি-ঘর-জমিজমা কম দামে মুসলিমদের বিক্রি করে চলে গিয়েছে। তাই এই অবস্থা। তবু হিন্দুরা প্রতিবাদ করছে না, মৌন হয়ে আছে। কারণ কি? ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু এতকিছুর পরেও কি এই ধর্মনিরপেক্ষতার ভালো-মন্দ বিচার করা উচিত নয়?

আমি ছোটবেলা থেকেই আরএসএস-এর সঙ্গে জড়িত ছিলাম এবং শৈশব থেকেই ভারতের সনাতন ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত থাকার কারণে, আমি বিদেশি, কমিউনিস্ট ভাবধারার চরম বিরোধী ছিলাম। একবার একটি কেসে সুপ্রিম কোর্ট-এ স্বামী বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন পিটিশনে দায়ের করে বলেছিল যে 'আমরা হিন্দু নই, আমরা হলাম রামকৃষ্ণ ধর্মের অনুসারী। তাই আমাদের সংখ্যালঘুর মর্যাদা দেওয়া হোক। সত্যিই এটা চমকে দেবার মতো বিষয়। কারণ যে স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকার বিশ্ব ধর্ম সম্মেলনে বিশ্বের ধর্মের প্রতিনিধিদের সামনে মাথা উঁচু করে বলেছিলেন, 'আমি নিজেকে হিন্দু বলতে গর্ব অনুভব করি', যে স্বামাজী বলেছিলেন, 'বিশ্বের সমস্ত ধর্মের মাতৃস্বরূপা হিন্দু ধর্মের প্রতিনিধি আমি', যে স্বামীজী বলেছিলেন 'I belong to such a religion into whose secred language, the Sanskrit, the word exclusion is untranslatable'; আর স্বামীজীর প্রতিষ্ঠিত সেই রামকৃষ্ণ মিশনই সুপ্রিম কোর্টে জানালো যে আমরা হিন্দু নই। আমরা হলাম রামকৃষ্ণ অনুসারী। হিন্দু এবং আমরা আলাদা। মজার কথা, এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে লড়াই করেছিল পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট সরকার। কিন্তু কি কারণে এই মামলা? একটু বিস্তারিত করে বলি। রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালিত বেলুড় পলিটেকনিক কলেজ রয়েছে। সেই কলেজের ৪ জন গ্রুপ-ডি কর্মচারী বামপন্থী কর্মী ইউনিয়নের সদস্য। তারা কলেজ পরিচালনায় সমস্যার সৃষ্টি করায় রামকৃষ্ণ মিশন তাদেরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করে। তখন সেই চারজন কর্মচারী কোর্টে কেস করে। কিন্তু কোর্ট রামকৃষ্ণ মিশনের বিপক্ষে রায় দেয়। তখন রামকৃষ্ণ মিশন নিজেদেরকে সংখ্যালঘু দাবি করে সুপ্রিম কোর্টে পিটিশন দেয়। কারণ কোনো প্রতিষ্ঠান সংখ্যালঘু মর্যাদা পেলে, সংবিধান অনুযায়ী সরকার সেই প্রতিষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। কারণ আমাদের মহান (?) সংবিধানে-এর ধারা ৩০ এবং ধারা ৩০-এ-তে বলা আছে যে, সংখ্যালঘুরা যদি কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাতে চায়, তবে তারা তা চালাতে পারবে এবং সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ থাকবে না। তাই নিজেদের সংস্থার স্বার্থে রামকৃষ্ণ মিশন নিজেদেরকে সংখ্যালঘু বাদি করেছিল। কিন্তু ওই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলো যে রামকৃষ্ণ মিশন সংখ্যালঘু প্রতিষ্ঠান নয়, এটি একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান। এবার আপনারা বলুন, এ কেমন সংবিধান আমাদের? যে সংবিধানের জন্যে কমিউনিস্টরা ধর্মবিরোধী, যারা প্রচার করে ধর্ম হলো আফিম, সেই কমিউনিস্টরাই রামকৃষ্ণ মিশনকে হিন্দু বানালো। আবার সেই সংবিধানের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সংখ্যালঘুরা যেমন—খ্রিস্টান, মুসলমানরা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালাচ্ছে। আমাদের সংবিধান তাদের এই অধিকার দিয়েছে। তাই তারা নিজেদের মতো সিলেবাস তৈরি করে পড়াচ্ছে। ধরুন, ৪ জন খ্রিস্টান মিশনারি মিলে একটা স্কুল শুরু করলো, তাহলে সংবিধান অনুযায়ী সেটা হলো সংখ্যালঘু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেমন—সেন্ট পলস, সেন্ট জেভিয়ার্স, ডন বস্কো প্রভৃতি। কিন্তু স্কুলে পড়ার মতো খ্রিস্টান ছাত্র তো নেই। তাই ঐসব স্কুলে পড়া ৯৯ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী হলো হিন্দু। আর ওই সমস্ত ছাত্রকে বাইবেল পড়ানো ওই খ্রিস্টান মিশনারিদের অধিকার, যা আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ মহান সংবিধান দিয়েছে। কিন্তু যে সরকারি স্কুলে ১০০ শতাংশ হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী পড়াশুনো করে, তারা সেখানে রামায়ণ, মহাভারত পড়তে পারবে না। কিন্তু আমাদের হিন্দুদের ট্যাক্সের টাকায় খ্রিস্টান স্কুলগুলি হিন্দু ছাত্রদের বাইবেল পড়াতে পারবে। এ কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা? ভাবুন আপনারা। অর্থাৎ হিন্দু তুমি ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে তুমি তোমার সন্তানকে খ্রিস্টান, মুসলমান বানাও এবং হিন্দুর ধর্মীয় শিক্ষার বিষয়ে আপত্তি জানাও। আর এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা চলছে বলেই কেন্দ্র সরকার প্রত্যেক মুসলমানকে হজে যাবার জন্যে ২৬, ০০০ টাকা ভর্তুকি দেয়। কিন্তু প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দেশের মুসলমানদেরকে হজে যাবার জন্যে কোনো ভর্তুকি দেয় না। তাই তো, ভারতের এই অতিরিক্ত মহান ধর্মনিরপেক্ষতা দেখে পাকিস্তানের এক মুসলমান ব্যক্তি হজে ভর্তুকি দেবার আর্জি জানিয়ে পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন। তিনি পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টে এই দাবি জানান যে ভারত যদি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র হয়ে হজে ভর্তুকি দিতে পারে, তবে পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও কেন হজে ভর্তুকি দেবে না—কোর্ট এই আবেদন গুরুত্বসহকারে বিচার-বিবেচনা করে এই রায় দিয়েছিল যে, কোরান-হাদিস অনুযায়ী হজ নিজের ব্যক্তিগত উপার্জনের টাকায় করা উচিত। এমনকি হজ ধার করা টাকাতেও করা উচিত নয়। তাই হজে সরকারি ভর্তুকি

দেওয়া হলো ইসলাম বিরুদ্ধ। কিন্তু তবুও ভারতে হজে যাওয়ার জন্যে মুসলিমদের ভর্তুকি দেওয়া হয়। এরই নাম হল ধর্মনিরপেক্ষতা।

এ কেমন ধর্মনিরপেক্ষতা, কোনো হিন্দু যখন কুম্ভমেলায় যায়, তখন তাকে ১০ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। কোনো হিন্দু যখন গঙ্গাসাগরে পূণ্যস্নান করতে যায়, তখন তকে ৫ টাকা ট্যাক্স দিতে হয়। এই পশ্চিমবঙ্গের অনেক হিন্দুর হয়তো জানা নেই যে, গঙ্গাসাগর মেলায় যেতে গেলে যে নদী পেরোতে হয় তার ভাড়া সারাবছর ৮ টাকা থাকলেও মেলার সময় ওই ভাড়া বেড়ে ৩০ টাকা হয়ে যায়। আবার নদী পার হওয়ার পর বাসে করে মন্দিরে যাবার যে ভাড়া সারাবছর ২০ টাকা থাকে, তা শুধুমাত্র সাগর মেলার সময় ৪০ টাকা হয়ে যায়। অর্থাৎ, এই দেশে ধর্মনিরপেক্ষতার নাম করে যেভাবে পারা যায় হিন্দুকে নিংড়ে নাও, শোষণ করো হিন্দুকে, আর মুসলমান, খ্রিস্টান যা চায় সব দিয়ে দাও। মাতা বৈষ্ণদেবী মন্দির শ্রাইন বোর্ড-এর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল, যার প্রধান হলেন জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল। কিন্তু রাজস্থানে তো আজমের শরীফ রয়েছে; সেখানে তো লক্ষ লক্ষ মানুষ যায়, সেখানে তো লাখ লাখ টাকা জমা পড়ে। তাহলে আজমের শরীফের জন্যে কেন কোনো বোর্ড তৈরি হবে না? কেন আজমের শরীফ সরকারের অধীনে আসবে না? আজ হিন্দুদের এই বিষয়গুলিকে অত্যন্ত গুরত্বসহকারে বিবেচনা করা দরকার। তা নাহলে মুসলিম জনসংখ্যা বাড়তেই থাকবে, হিন্দু সংখ্যালঘু হয়ে পড়বে, যা আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যে মোটেই সুখকর হবে না। আমি হিন্দু সমাজের বয়স্ক মানুষদের অনুরোধ করবো, তারা যেন যুব প্রজন্মকে বলেন কেন ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত ভাগ হয়েছিল। তারা যেন যুবকদেরকে বলেন, কেন মুসলিমদের আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দিতে হয়েছিল, কেন বাংলা ও পাঞ্জাব ভাগ করে পাকিস্তান হয়েছিল? আপনারা জানেন কেন উত্তরপ্রদেশ কিংবা বিহার ভাগ হয়ে পাকিস্তান তৈরি হয়নি? কারণ বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দুরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছিল এবং মুসলিমরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হয়েছিল। তাই তো বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করে মুসলিমদেরকে তাদের সাধের 'পাক' দেশ দিতে হয়েছিল। তাই হিন্দুদের আজ চিন্তা করা উচিত, শুধুমাত্র হিন্দু সংখ্যালঘু হওয়ার জন্যে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে যদি পাকিস্তান সৃষ্টি হতে পারে, তবে একই ঘটনা কিন্তু আজও ঘটতে পারে।

আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রতি আমার বিশাল ক্ষোভ রয়েছে। আমরা হিন্দুদের দুরাবস্থার জন্যে শুধু রাজনীতি নেতাদের গালাগালি দিই, দোষ দিই। শুধু নেতাদের গালাগালি দিয়ে কোনো লাভ হবে না। কারণ আমাদের পূর্বপুরুষরা কি করছিল? যে স্বাধীনতার জন্যে ভগৎ সিং ফাঁসিতে নিজের প্রাণ দিয়েছিল, সেই ভগৎ সিং-এর জন্মস্থান লাহোর কেন আজ স্বাধীন ভারতে নেই? এইসব প্রশ্ন কেন আমাদের পূর্বপুরুষরা করেনি? আমাদের পূর্বপুরুষরা প্রশ্ন করেনি বলে আমরাও কি এইসব প্রশ্ন করবো না? শুধুমাত্র নিজের ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে চুপ করে থাকবো? এদেশে ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে স্কুলে পড়ানো হয়, হিন্দু ও মুসলমান হলো ভারতমাতার দুই সন্তান। আর দুই সন্তান মিলেই ভারতকে স্বাধীন করেছিল। কিন্তু বাস্তব কি বলে? ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা ও পাঞ্জাব এই দুই রাজ্য থেকে সবথেকে বেশি সংখ্যক যুবক শহীদ হয়েছিল। কিন্তু বাংলায় সেই শহীদের তালিকায় একজনও মুসলমান নেই কেন? কেন হিন্দুরা এই প্রশ্ন করবে না? সেই সময় বাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ৫৪ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও স্বাধীনতা আন্দোলনে কেন একজনও মুসলমান এই বাংলা থেকে শহীদ হয়নি? মুসলমানও তো ভারতমাতার সন্তান। তাহলে মা-কে স্বাধীন করার দায়িত্ব তো মুসলমানের রয়েছে। কিন্তু যখনই কোনো হিন্দু এই প্রশ্ন করে, তখনই মুসলমানের দালালেরা বলে যে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষাদীক্ষার অভাব ছিল, তাই তারা স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেয়নি। কিন্তু বাস্তব সত্য হলো এই যে, হিন্দুরা যখন স্বাধীনতা আন্দোলন করছিল, তখন মুসলমানরা ব্যস্ত ছিল পাকিস্তান তৈরিতে। জিন্নাহ যখন পাকিস্তানের দাবি পেশ করলেন, তখন নেহেরু, গান্ধীসহ কংগ্রেসের তাবড় তাবড় হিন্দু নেতারা তা উড়িয়ে দিলেন। নেহেরু বললেন, 'The idea of Pakistan is fantastic nonsense.' গান্ধীজি বললেন, 'যদি ভারত ভাগ করে পাকিস্তান হয়, তবে তা আমার মৃতদেহের ওপর দিয়ে হবে। এইসব নেতাদের কথায় কোটি কোটি হিন্দু বিশ্বাস রাখল। কিন্তু তারপরেও ভারত ভাগ হয়ে মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান তৈরি হলো। তারপর পাকিস্তানে থাকা সমস্ত হিন্দুদের তাড়িয়ে দিলো পাকিস্তানের মুসলমানরা। কিন্তু মুসলমানদের জন্যে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান দেওয়া সত্ত্বেও ভারতে বিশাল সংখ্যক মুসলমান থেকে গেলো। এটাই হালোধর্মনিরপেক্ষতা। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা বলে আসছে যে স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমান যোগ দিতে পারেনি, কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামীরা গীতা পড়তো, দুর্গাপূজা করতো। কিন্তু মুসলমানরা তো আল্লার নাম একটি আলাদা বিপ্লবীর দল তৈরি করতে পারতো। মুসলমানরা যদি পাকিস্তান তৈরি

করার জন্যে একটি আলাদা পার্টি বানাতে পারে, তাহলে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যে কেন আলাদা বিপ্লবী দল বানাতে পারেনি?

ধর্মনিরপেক্ষতার আর একটা দিক হলো এই যে, ইংরেজ শাসনকাল থেকে ভারতে এটা প্রচার করা হচ্ছে যে, ভারতে মুসলমানরা পিছিয়ে আছে, তাদের মধ্যে শিক্ষা-সচেতনতার অভাব; তাই তাদের সমস্ত সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য। স্বাধীনতার এতো বছর পরেও মুসলমানদেরকে অনেক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হচ্ছে। আর হিন্দুরাও এতবছর চুপ করে থেকে থেকেছে ওই ধর্মনিরপেক্ষতার কথা ভেবে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? সত্যিই কি মুসলমানদের সচেতনতার অভাব? স্বাধীনতার পূর্বে, ভারতের দুটি রাজ্য বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলিম জনসংখ্যা সবথেকে বেশি ছিল। ওই দুটি রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন স্যার সিকান্দার হায়াত খান; আর বাংলায় তিনজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। প্রত্যেকেই মুসলমান-খাজা নাজিমুদ্দিন, ফজলুল হক, এবং সুরাবর্দি। এই সেই কুখ্যাত সুরাবর্দি যে সুরাবর্দি ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট কলকাতায় ডাইরেক্ট অ্যাকশন-এর ডাক দিয়ে Great Calcutta Killing ঘটিয়েছিলেন, ঐদিন কলকাতায় ৫০০০ হিন্দুকে কচুকাটা করা হয়েছিল পাকিস্তানের দাবিতে। বাংলার তিনজন মুখ্যমন্ত্রীর তিনজনই মুসলমান। কেন একজনও হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারলো না? বাংলায় বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন দাশ, আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়-এর মতো ভারতবিখ্যাত নেতা থাকা সত্ত্বেও তারা কেন মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেননি? কারণ একটা বাস্তব সত্যি কথা হলো এই যে মুসলমানরা শিক্ষায় যতই পিছিয়ে থাক না কেন, রাজনৈতিক সচেতনতা, ক্ষমতা দখল করার সচেতনতা আমাদের হিন্দুদের থেকে হাজার গুণ বেশি। এই বাস্তব সত্য আমাদের পূর্বপুরুষরা বুঝতে চায়নি, যা আমাদের বর্তমান যুবপ্রজন্মকে বুঝতে হবে। তাই তো রাজ্যে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি, তাই মুখ্যমন্ত্রীও একজন মুসলমানই হবে। তাদের এই সচেতনতা বেশি বলেই কাশ্মীরে অমরনাথ শ্রাইন বোর্ডকে মাত্র ১০০ একর জমি দেবার বিরোধিতা করে আন্দোলন করে। মুসলমানদের রাজনৈতিক সচেতনতা বেশি বলেই আসামে আনোয়ারা তৈমুর, মইনুল হক চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে, কিন্তু মুসলিম প্রধান রাজ্যে কোনোদিন কোনো হিন্দু ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে না। এরই নাম আজকে ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষতা আমাদের হিন্দুদের সর্বনাশ করে দিচ্ছে। আজকের ভারতের যুবপ্রজন্মকে এক মারাত্মক সত্যি কথা জানতে দেওয়া হয়নি যে আসাম আর মাত্র দশবছর ভারতে থাকবে। আসামে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকাতে হিন্দু কোনোদিন মাথা উঁচু করে বাঁচতে পারে না। একই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গের তিন জেলা এবং বিহারের কাটিহার, পূর্ণিয়া এবং কিষাণগঞ্জে। এর অর্থ হলো এই যে, এই দেশে আর একটি পাকিস্তান তৈরি হচ্ছে। কারণ সমস্ত মুসলমানের সামনে একটি লক্ষ্য রয়েছে, একটি স্বপ্ন রয়েছে—পাকিস্তান। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, হিন্দু সম্প্রদায়ের সামনে কোনো লক্ষ্য নেই, কোনো স্বপ্ন নেই। ব্যক্তিগতভাবে হিন্দুদের আলাদা আলাদা স্বপ্ন রয়েছে। একজন ব্যক্তি হিন্দু স্বপ্ন দেখে যে সে তার ছেলেকে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার বানাবে। কিন্তু হিন্দুজাতির সামনে কোনো স্বপ্ন নেই। একজন মুসলমান স্বপ্ন দেখে দুনিয়াকে 'দার-উল-ইসলাম' বানানোর। কিন্তু হিন্দুদের কিছু নেই। আমি হিন্দুদেরকে একটি প্রশ্ন করতে চাই, জাতি হিসেবে তোমাদের সামনে কোনো লক্ষ্য বা স্বপ্ন আছে কি? না, নেই, কিছুই নেই। কিন্তু আমাদের পূর্বপুরুষরা আমাদেরকে স্বপ্ন দিয়ে গিয়েছিলেন, 'বসুধৈব কুটুম্বকম' এবং 'কৃণ্বন্তো বিশ্বমার্য্যম্'। কিন্তু বর্তমানে হিন্দুসমাজে এই লক্ষ্য আর বেঁচে নেই। এই কথা বইয়ের পাতায় লেখা থাকবে, কিন্তু কোনো হিন্দুর মনে কোনোদিন থাকবে না।

একবার দিল্লিতে দীপাবলি অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে গিয়েছিলাম। সেই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ছিল পশ্চিম পাঞ্জাব থেকে আসা পাঞ্জাবি রিফিউজিরা। আমি তাদেরকে বলছিলাম যে আমরা দীপাবলি পালন করি ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের ১৪ বছর বনবাসের পর বাড়ি ফিরে আসার আনন্দে। সেই দিন অমাবস্যার দিন ছিল, তাই অযোধ্যাবাসীরা পুরো অযোধ্যাকে প্রদীপ দিয়ে সাজিয়েছিল। তাই আপনারা ঐদিন অন্তত সংকল্প করতে পারেন, একদিন আমরা আমাদের জন্মস্থান লাহোর, করাচি বা রাওয়ালপিণ্ডিতে গিয়ে দীপাবলি পালন করব। কিন্তু তা তারা করে না। কারণ একটি জাতি হিসেবে আমাদের সামনে কোনো লক্ষ্য নেই, কোন স্বপ্ন নেই। কারণ হিন্দুসমাজ তার লক্ষ্য, স্বপ্ন হারিয়ে ফেলেছে। আমাদের হিন্দুদের অস্তিত্ব তো টিকে আছে, কিন্তু আমাদের স্বপ্ন হারিয়ে গিয়েছে। আমরা যখন হিন্দুদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচারের কথা বলতে থাকি, তখন কিছু বয়সে বড়, প্রবীণ হিন্দু ব্যক্তি আমাকে উপদেশ দেয় যে তুমি কি একাই হিন্দুধর্মকে বাঁচাবে? আরে এ হলো সনাতন ধর্ম; এ কখনো ধ্বংস হবে না, স্বয়ং ভগবান একে রক্ষা করবেন। একথা ঠিক যে সনাতন ধর্ম হয়তো ধ্বংস হবে না। কিন্তু ওই বয়স্কদের এই জ্ঞান নেই যে, সনাতন ধর্ম হয়তো ভারতে বেঁচে থাকবে না। হয়তো এও হতে পারে, সনাতন

ধর্ম ওয়াশিংটনে বেঁচে থাকবে, হতে পারে টোকিওতে সনাতন ধর্ম বেঁচে থাকবে। কারণ আজ তো লাহোরে সনাতন ধর্ম বেঁচে নেই। আজ আফগানিস্তানের কান্দাহার, যা মহাভারতের গান্ধার, যার রাজকুমারী ছিলেন গান্ধারী, সেখানেও আজ সনাতন ধর্ম জীবিত নেই। সিন্ধুনদীর তীর, যেখানে একসময় বেদমন্ত্র উচ্চারিত হতো, সেখানে আজ সনাতন ধর্ম জীবিত নেই। তাই একথা প্রমাণিত হয় যে, আমাদের সমাজের যুবপ্রজন্মকে ভুল শিক্ষা দিয়েছে বয়স্করা। তবে একথা ঠিক যে সনাতন ধর্মের মৃত্যু হবে না, বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সনাতন ধর্ম জীবিত থাকবে। কিন্তু সনাতন ধর্মের উৎসস্থল, পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে হয়তো আর এই সনাতন ধর্ম জীবিত থাকবে না, যদি অবিলম্বে হিন্দুজাতি না জেগে ওঠে। তাই বর্তমান সময়ে হিন্দুচেতনা এবং হিন্দুসুরক্ষা খুবই জরুরি। আজ প্রতিটি হিন্দুকে এ কথ জিজ্ঞেস করতে হবে, কেন স্বাধীনতার লড়াইয়ে মুসলমান রক্ত দেয়নি? কেন স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান শহীদ হয়নি? মাতৃভূমির মুক্তিসংগ্রামে রক্ত না দিয়ে, শহীদ না হয়ে যখন দেশ স্বাধীন হলো, তখন ভাগ চাইতে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুসলমান। সেই দাবী মেনে ভারতের সমস্ত মুসলমানের জন্যে পাকিস্তান দিয়ে দেবার পরও কোন্ অধিকারে ভারতে মুসলমান থাকে? এ কেমন ভাগাভাগি? এ যেন দুই ভাইয়ের সম্পত্তি ভাগাভাগি। ছোটভাই বড়ভাইয়ের কাছে গিয়ে বলল, দেখ, এটা তো আমার ভাগের সম্পত্তি, এটা আমার থাক। আর আমি তোমার জায়গায় দুজনে মিলেমিশে থাকবো। কিন্তু যে গান্ধী-নেহেরুকে দেশের জনতা বিশ্বাস করেছিল, তারা কখনও একথা মুখে স্বীকার করেনি যে হিন্দু-মুসলমান দুটি পৃথক জাতি। কিন্তু তবুও দ্বি-জাতি তত্ত্বকে মেনে নিয়ে ভারতে ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল। এইভাবে অন্যায়ভাবে মুসলমানের দাবি মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও কি হলো? মুসলমানদের পাকিস্তান দেবার পরও কাশ্মীর থেকে সমস্ত হিন্দুদের তাড়িয়ে দেওয়া হলো এবং কাশ্মীর মুসলিম প্রধান অঞ্চলে পরিণত হলো। হিন্দু কোনো প্রতিবাদ করেনি, কারণ সে তখন ধর্মনিরপেক্ষ নাম জপ করেছিল। আর ঠিক এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষ নাম জপ করতে করতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, বিহার, একের পর এক রাজ্য পাকিস্তানে পরিণত হবে।

তাহলে শেষ পর্যন্ত ভারতের কোন রাজ্য নিরাপদ থাকবে, যেখানে হিন্দুরা স্বস্তিতে শ্বাস নিতে পারবে? এইভাবে ধর্মনিরপেক্ষতা চলতে থাকবে এবং ভারত থেকে হিন্দুদের চিহ্ন মুছে যাবে, ঠিক যেভাবে পারস্য (বর্তমান ইরান) থেকে পার্সিরা মুছে গিয়েছে। এই একই ভবিষ্যৎ কি হিন্দুদের জন্যে অপেক্ষা করে আছে? তাই আজ আর আপোসের সময় নয়। হিন্দু যুবকদেরকে শাস্ত্র থেকে শিক্ষা নিতে হবে ধর্ম বাঁচাতে, মঠ-মন্দির বাঁচাতে, মা-বোনের ইজ্জত বাঁচাতে। আর হিন্দু যদি এখন হাতে অস্ত্র তুলে না নেয়, তাহলে হিন্দু নিজেদেরকে কোনোদিন রক্ষা করতে পারবে না। শুধু সংগঠন, সংগঠন করলে চলবে না। সংগঠন অনেক হয়েছে। জঙ্গলে সব প্রাণীর মধ্যে ভেড়ারাই সব থেকে শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং সংগঠিত প্রাণী। দুশো ভেড়া কি সুন্দরভাবে লাইন দিয়ে রাস্তা দিয়ে যায়। কিন্তু যখনই একটি কুকুর কোনো একটি ভেড়াকে কামড়ে ধরে নিয়ে যায়, তখন কিন্তু ওই সংগঠিত দুশো ভেড়া তাকে বাঁচাতে যায় না। তাই সংগঠন, নয়, বীর হওয়া জরুরি। ভেড়াদের সংগঠন দিয়ে কোনো কাজ হবে না। হিন্দু যুবকরা মনে রেখো গান্ধার (বর্তমান কান্দাহার) নিলো; তারপর সিন্ধ, পাঞ্জাব এবং পূর্ব পাকিস্তান নিলো; তারপর কাশ্মীর নিলো। তোমরা কি ইতিহাসের গতি দেখতে পাচ্ছ না? দেখতে পাচ্ছ না যে আমাদের জন্মভূমি ধীরে ধীরে ছোট হয়ে আসছে? হিন্দুদের মাটি ক্রমশ ছোট হয়ে আসছে, আর মুসলমানদের মাটি ক্রমশ বাড়ছে। তবুও আমরা সব জেনেশুনেও আমরা মুসলমানদের প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। এ আমাদের অদ্ভূত ধর্মনিরপেক্ষতা, মুসলমানরা তাদের সংখ্যা বাড়িয়ে চলেছে, তবু তাদেরকে আমরা প্রশ্রয় দিয়ে চলেছি। আর উল্টোদিকে হিন্দুর সংখ্যা কমেই চলেছে। ধর্মনিরপেক্ষতার নাম দিয়ে মুসলিমদের জন্যে পার্সোনাল ল বোর্ড দিয়ে দেওয়া হলো। ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, তাই মুসলমান চারটি বিয়ে করতে পারবে, সেটা আবার মেনে নিতে হবে, কারণ ওটা হলো মহান আল্লাহতালার আইন। কেউ মুসলমানকে গিয়ে কেন জিজ্ঞেস করে না যে আমেরিকা, ইংল্যান্ডে তো মুসলমানরা থাকে, সেখানে কোনো মুসলমান যদি একটা বিয়ে করে মুসলমান থাকতে পারে, তবে কেন ভারতে থাকতে পারবে না? আর একটি কথা হলো এই যে আল্লাহ-এর আইন শরীয়ত একদম সঠিক। আমি মেনে নিচ্ছি একথা। শরীয়ত অনুযায়ী, চুরি করলে হাত কেটে নেওয়া হবে; ব্যাভিচার করলে পাথর ছুঁড়ে হত্যা করা হয়; ধর্ষণ করলে কোমর পর্যন্ত বালিতে পুঁতে দেওয়া হয়। তাই আমি দাবি জানাচ্ছি ভারতের যত মুসলিম অপরাধী সমস্ত জেলে আছে, তাদের শরীয়ত আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হোক। না, তখন কিন্তু মুসলমান শরীয়তের আইন মানবে না। কেন মানবে না? কেন মুসলমানদের এই দুমুখো নীতি? অর্থাৎ মুসলমান চারটে বিয়ের জন্যে শরীয়তের বাহানা দেবে। মুসলমানের এই সুবিধাবাদী নীতিকে মেনে নেবার নামই হলো ধর্মনিরপেক্ষতা।

তাই এই ধর্মনিরপেক্ষতা হিন্দুর জন্যে সবদিক থেকেই সর্বনাশ করেছে। আমরা যদি এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে এখনো আঁকড়ে পড়ে থাকি, তাহলে আমাদের জন্যে বিরাট সর্বনাশ আসবে। তাই তো আজ ভারতের প্রতিটা হিন্দু উপলব্ধি করছে যে, ধর্মনিরপেক্ষতার কারণে ভারত ভেঙে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল, কোটি কোটি হিন্দু ঘরছাড়া, ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছিল। তাই স্বাধীনতার ৭০ বছর পর এখনো যদি ধর্মনিরপেক্ষতার ঢং করি, তাহলে পুরো ভারত পাকিস্তান হয়ে যাবে—যা আসাম, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার দিয়ে শুরু হবে। তাই আমাদের এই সেক্যুলারিজম চাই না। আমাদের হিন্দুরাষ্ট্র চাই, হিন্দু রাজ্য চাই এবং ভারতে হিন্দু শাসন চাই।

আমার ঠাকুর

আমার ঠাকুর অস্ত্রধারী।
আমার ঠাকুর যোদ্ধা।।

দুর্বলেরা হিন্দু না
হতেও পারে বোদ্ধা।
আমার ঠাকুর যুদ্ধ করে—
পুরুষ হোক বা নারী।

আমি হিন্দু, এমনিতে তাই—
যোদ্ধা হতে পারি।

আমি হিন্দু – রক্তবিন্দু
ভগবানের দান।
আমার লক্ষ্য—
অসুর মুক্ত আমার হিন্দুস্থান।।

ধর্মনিরপেক্ষতা

অমিত মালী

নিরপেক্ষতা একটি মহান শব্দ। মহান শব্দ সবসময় শুনতে ভালো লাগে, আলাদা একটা আত্মসন্তুষ্টি পাওয়া যায়। কিন্তু নিরপেক্ষতা এমনই একটি জিনিস, যাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে কোনোদিন নিজের জন্যে ভালো করা যায় না। এবং অন্যেরও তাতে ভালো হয় না। এক কথায় বললে বলতে হয়, নিরপেক্ষতা সবসময় ক্ষতিকারক। ধরা যাক, একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলেন কিছু বখাটে যুবক একটি যুবতী মেয়ের শ্লীলতাহানি করছে। কিন্তু ব্যক্তিটি যেহেতু নিরপেক্ষ, তাই তিনি মহিলাটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেন না। কারণ, তাহলে উনার নিরপেক্ষতা নষ্ট হবে। কিন্তু নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে গিয়ে কি ফল হলো? যুবকরা যুবতীটির শ্লীলতাহানিতে কোনো বাধা পেলো না। ফলে ওই ব্যক্তিটি পরোক্ষভাবে ওই যুবকদেরকে সমর্থন করে বসলেন।

আমাদের রাষ্ট্রও ধর্মনিরপেক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্রের কোনো ধর্মীয় চরিত্র নেই এবং রাষ্ট্র কারোও ধর্মপালনে হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু বাস্তবে কি হলো? দেশের হিন্দু জনগণকে ধর্মনিরপেক্ষতার ট্যাবলেট খাওয়ানো হলো এবং রাষ্ট্র মুসলিমকে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স দিলো। এমনকি সমাজে একটা ধারণা ছড়িয়ে দেওয়া হলো যে ধর্মনিরপেক্ষতা একটা আধুনিক চিন্তাভাবনা; আর দেশপ্রেম, হিন্দুত্ব একটা ব্যাকডেটেড চিন্তাভাবনা। মুসলিমদের ভালোবাসাটা হলো আধুনিকতা। তুমি যদি দেশকে ভালোবাসো, তাহলে তুমি সংকীর্ণ মনের মানুষ। আর যদি দেশের কথা চিন্তা না করে যদি অন্যদেশকে নিয়ে চিন্তায় ডুবে থাকো, তাহলে তুমি আধুনিক। আর এই আধুনিক আত্মঘাতী ধর্মনিরপেক্ষতার ভাবনা রাজনীতি করা বুদ্ধিজীবীরা দিলো স্কুল-কলেজের প্রসেফরকে, তারা তা ছড়িয়ে দিলো দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে। তাই তো, দেশস্বাধীন হবার পর থেকে আমাদের মহান রাষ্ট্র ওই নিরপেক্ষ ব্যক্তিটির মতো আচরণ করতে লাগলো—অর্থাৎ মুসলমান খারাপ কাজ করলেও, অন্যায় করলেও দেখেও না দেখার ভান করে এড়িয়ে যাওয়া। ফলে রাষ্ট্রের সংবিধান, আইন, প্রশাসন ও পুরো সিস্টেম মুসলমানের অন্যায় কাজ কে সমর্থন করে বসলো। ফলে হিন্দু এমনিতেই কোণঠাসা হয়ে ছিল, আর এতবছর ধর্মনিরপেক্ষতার শাসনে হিন্দুর আজ শান্তিকে থাকার মতো একটাও জায়গা ভারতে নেই। আর এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে ঢাল করে ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হিন্দুদেরকে নিজেদের শিকার বানিয়েছে। আর রাষ্ট্র যেহেতু ধর্মনিরপেক্ষ, তাই সে দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু রাষ্ট্রের দায়িত্ব ছিল অন্যায়কারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর, কিন্তু রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ, তাই সে পরোক্ষভাবে মুসলমানকে সমর্থন করেছে। কিন্তু এই পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল। কিন্তু হিন্দু যখন নিজেদের ওপর ঘটে চলা অত্যাচারের বদলা নিতে যায়, তখন কিন্তু রাষ্ট্রের আইন-প্রশাসন দর্শক হয়ে থাকে না। তখন সক্রিয় হয়ে ওঠে, শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার অজুহাত দিয়ে হিন্দুদেরকে RAF দিয়ে পেটানো হয়, গ্রেপ্তার করে জেলে ঢোকানো হয়। আর তখনিই ধর্মনিরপেক্ষতার হিসেবে গোলমাল দেখা যায়। তখন হিন্দু বুঝতে পারে, রাষ্ট্র তার ধর্মের প্রতি বিমাতৃসুলভ আচরণ করছে, সে হিন্দু বলেই তাকে বঞ্চনা করা হচ্ছে। আর তখনই হিন্দুদের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি ঘৃণা জন্মায়। আর সেই ঘৃণা থেকে মুক্তি পাওয়ার আকাঙ্খা থেকেই নিজের ধর্মের জন্যে আলাদা একটি দেশ-এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দেশের স্বাধীনতার পর থেকে এতদিন এইভাবেই চলে আসছে।

আমরা সবাই মুখে বলি আইন সবার জন্যে সমান। কিন্তু বাস্তবে ঠিক তার উলটো। এ এমন মহান ধর্মনিরপেক্ষতা, হিন্দুর জন্যে এক আইন আর মুসলমানের জন্যে আলাদা আইন। দেওয়ানি আইন হিন্দুর জন্যে আলাদা এবং মুসলমানদের জন্যে আলাদা। হিন্দু বিয়ে করতে পারবে একটি, কিন্তু মুসলমান চারটি বিয়ে করতে পারবে। মুসলমান তার যখন ইচ্ছে সে তালাক দিয়ে তার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। হিন্দুর ধর্মীয় শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুর দেশে, কিন্তু মুসলিম তার ধর্মীয় শিক্ষার জন্যে মাদ্রাসা চালাবে সরকারী টাকায়। হিন্দু তার পুজোয় যদি মাইক বাজাতে চায়, তবে তাকে পুলিশ-প্রশাসনের কাছে অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু মুসলমান দিনে পাঁচবার মাইকে আজান দিলেও তার জন্যে কোনোদিন কোনো অনুমতির দরকার নেই। সংখ্যালঘু বৃত্তির নামে লাখ-লাখ মুসলমান ছাত্র-ছাত্রী টাকা পায়, কিন্তু গরিব হিন্দু ছাত্র-ছাত্রী এক টাকাও সরকারের কাছ থেকে পায় না কোনোদিন। ভাবখানা এমন যেন, হিন্দু তো সংখ্যায় বেশি। তাই ওদের কিছু দরকার নেই। আর মুসলমান সংখ্যায় কম। তাই মুসলমান যা চায়, দিয়ে দাও। শুধু দাও আর দাও। পেতে পেতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে মুসলমান হয়তো এইবার আলাদা দেশ চেয়ে বসবে। এটাই হলো ধর্মনিরপেক্ষতার মহিমা। আর এই ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম এমন পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে যে মুসলিম তোষণে ভারতবর্ষ পৃথিবীর তাবড় তাবড় মুসলিম রাষ্ট্রকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। পৃথিবীতে ৫৭টি মুসলিম রাষ্ট্র থাকলেও কোনো দেশ হজে যাবার জন্যে জনগণের ট্যাক্সের টাকা না দিলেও আমাদের মহান দেশ ভারতবর্ষ দেয়। আর দীর্ঘদিন এইভাবে চলতে চলতে দেশের সরকার ভুলে গিয়েছে আদিবাসী-জনজাতি মানুষদের কথা, যে আদিবাসী-জনজাতি মানুষেরা শত অভাব সত্ত্বেও, খিদের যন্ত্রণা থাকা সত্ত্বেও তারা দেশের বিরুদ্ধে কোনোদিন যুদ্ধ ঘোষণা করেনি। তাদের কথা শিক্ষিত, ধর্মনিরপেক্ষ মানুষ বা নেতারা কোনোদিন চিন্তা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। হিন্দু রাজনৈতিক নেতারা নিজেদের সেক্যুলার প্রমাণ করতে গিয়ে মুসলমানদের দাবি-দাওয়া নিয়ে শহরের রাজপথ, বিধানসভা এমনকি পার্লামেন্ট পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়। কিন্তু অশিক্ষিত, অভুক্ত, বঞ্চিত আদিবাসীদের কথা কেউ বলে না। এর জন্যেও দায়ী আমাদের ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষ মানসিকতা হিন্দু সমাজের প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের অন্ধ করে তুলেছে—যার ফলে সে বাস্তব সত্যটাকে অনুভব করতে পারেনি। ফলে ধর্মনিরপেক্ষ হিন্দুরা মুসলমানদেরকে ধরে-বেঁধে দেশপ্রেমিক প্রমাণ করতে চেষ্টার কোনো খামতি রাখেনি। কিন্তু লোহাকে কি সোনা বানানো যায়? তাই এতো বছর চেষ্টা করেও মুসলমানকে দেশপ্রেমিক বানানো যায়নি। এখনও তাদের মন পড়ে আছে পাকিস্তানের দিকে। আর এখানেই আমাদের সেক্যুলারিজম চরমভাবে ব্যর্থ। তারা দেশপ্রেমিক নয় বলেই তো ভারতবর্ষে মুসলমানদের এতগুলি জিহাদি সংগঠন; কত নাম তাদের—সিমি, জামাত-ই-ইসলামী, জয়েশ-এ-মহম্মদ, লস্কর-ই-তোইবা, ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন, হিজবুল মুজাহিদিন। তবুও হিন্দুদের বিশ্বাস করতে হবে এই দেশ ধর্মনিরপেক্ষ। ধর্মনিরপেক্ষতা আছে, তাই মুসলিম ছাত্র হিসেবে স্কলারশিপ নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ইয়াসিন ভাটকল ইন্ডিয়ান মুজাহিদিন তৈরি করে দেশের বিরুদ্ধে জেহাদ করে; আফজল গুরু, জিহাদি আজমল কাসাভকে সাহায্য করে ভারতীয় মুসলমানরা। তবুও কি এই মহান সেক্যুলারিজম। এইসব দেশদ্রোহী মুসলমানদের জন্যে সরকার নিজের টাকায় এদের পক্ষে উকিল নিয়োগ করে। এতো কিছুর পরেও সব মুসলমান সমান নয়—মুসলমানরাও দেশপ্রেমিক হয়, এইসব কথা বলতে হবে। কারণ ওই ধর্মনিরপেক্ষতা। ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখার দায় কি শুধু হিন্দুর? কেন মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ হবে না? মুসলমান হবে খাঁটি মুসলমান আর হিন্দু হবে ধর্মনিরপেক্ষ? এটাই সেক্যুলারিজম? এইভাবে বেশিদিন চলতে পারে না। তার আভাস এখন পরিস্কার।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দু যুব প্রজন্ম কি এই ধর্মনিরপেক্ষতাকে বজায় রাখতে চায়? এই প্রশ্ন বর্তমানে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক। কারণ স্বাধীনতার এতবছর পরেও দেশে

১০০ শতাংশ মানুষ প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হলেও শিক্ষিতের হার অনেক বেড়েছে। বেড়েছে প্রযুক্তির ব্যবহার। সব চেয়ে বড় কথা হলো ভারতবর্ষ বর্তমানে যুবক দেশ। এক রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতবর্ষে মোট জনসংখ্যার ৬০ শতাংশ মানুষের বয়স ৩৫ বছরের নিচে। আর আমাদের সবারই জানা যুবকের রক্ত তাজা এবং গতিশীল হয়। যুবকদের একটা বড় গুণ হলো তারা প্রশ্ন করতে ভয় পায় না। তারা প্রশ্ন করে জানতে চায় কেন মুসলমানদের সব অন্যায় মেনে নেওয়া হয়? উত্তর সেই বস্তাপচা ধর্মনিরপেক্ষতা। কিন্তু বস্তাপচা, অকেজো জিনিসকে যুব প্রজন্ম গ্রহণ করেনি। আর সেই কারণে যুব প্রজন্মের রক্তে ধর্মনিরপেক্ষতা, মার্কসবাদী, গান্ধীবাদ বা নেহেরুবাদের আবর্জনা সেরকমভাবে প্রবেশ করতে পারেনি। কারণ হিন্দু যুবক দেখেছে, কলেজে তার থেকে কম নম্বর পাওয়া মুসলিম ছাত্র-ছাত্রী শুধুমাত্র ওবিসি কোটার সুযোগ নিয়ে কলেজে ভর্তি হতে পেরেছে; সে দেখেছে আশেপাশের হিন্দু গ্রাম মুসলমানদের আক্রমণে জ্বলে গিয়েছে, ভিটেমাটি ছাড়া হয়ে গিয়েছে হিন্দু; সে দেখেছে পাড়ার হিন্দু দিদি লাভ-জিহাদের শিকার হয়ে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করেছে। হিন্দু যুবক দেখেছে মসজিদের পাশ দিয়ে তার প্রিয় দুর্গামাতার বিসর্জনের শোভাযাত্রা নিয়ে যেতে বাধা দিয়েছে মুসলমান জনতা, মহরমের মিছিলের নাম করে মন্দির ভেঙেছে মুসলিম জনতা। এইসব শোনার দেখার পর একমাত্র জড়বস্তুই স্থির থাকতে পারে। তাইতো হিন্দু যুব প্রজন্ম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে আত্মঘাতী ধর্মনিরপেক্ষতাকে, আপন করে নিয়েছে হিন্দু স্বার্থকে, হিন্দুর দুঃখ-কষ্ট, অপমানকে নিজের অপমান বলে ভাবতে শুরু করেছে। হিন্দু যুব প্রজন্ম আপন করে নিয়েছে হিন্দুত্বকে। নিজেরাই হিন্দু সমাজের জন্যে কিছু করার, আক্রান্ত হিন্দুর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। সমাজের আর বাকি হিন্দুদের সচেতন করতে চাইছে যুবপ্রজন্ম। কিন্তু পাশে কোনো গণ-মাধ্যমকে, সংবাদপত্রকে পায়নি। আজ যুব প্রজন্ম বুঝে গিয়েছে সংবাদপত্র তার মেরুদণ্ড আরবের পেট্রো-ডলারের কাছে বিক্রি হয়ে গিয়েছে। তাই যুব প্রজন্মের হিন্দুত্বের প্রসারে-রক্ষণে সক্রিয় অংশগ্রহণ দেখে ঘুম উড়ে গিয়েছে ধর্মনিরপেক্ষতার এন্টিবায়োটিক ব্যবসায়ীদের। আর বিজ্ঞান বলে, দীর্ঘবছর একই এন্টিবায়োটিক খেলে সেই ওষুধ আর কাজ করে না শরীরে। কারণ শরীরে এন্টিবডি তৈরি হয় না, যা সেই ওষুধের কাজকে বাধা দেয়। হিন্দু সমাজের মধ্যেও সেই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। কারণ ধর্মনিরপেক্ষতার এন্টিবায়োটিক ধরে-বেঁধে খাওয়ালেও গ্রহণ করছে না হিন্দু সমাজ। তাই তো হিন্দু জাগছে, নিজের ধর্মের পতাকাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার কাজ করছে। আজ আর পিছিয়ে যাবার সময় নয়, আজ মাথা নিচু করার সময় নয়; সময় এসেছে ধর্মের পতাকাকে উচ্চে তোলার, সময় এসেছে প্রতিরোধ-প্রতিশোধের, যা শুধুমাত্র ধর্মযুদ্ধের দ্বারা সম্ভব। এই যুদ্ধে হিন্দু জিতবে, যুবকের তাজা রক্তই জয় এনে দেবে। সেই দিন আর বেশি দূরে নেই।

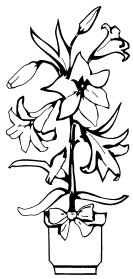

"যাহারা বৃদ্ধ হইতে চলিয়াছে, তাহারাই অদৃষ্টের দোহাই দেয়। যুবকেরা সাধারণতঃ জ্যোতিষের দিকে ঘেষে না। প্রহবৈগুণ্যের প্রভাবে আমরা হয়ত আছি, কিন্তু তাহাতে আমাদের বেশি কিছু আসে যায় না। বুদ্ধ বলিয়াছেন, 'যাহারা নক্ষত্র গণনা, এরূপ অন্য বিদ্যা বা মিথ্যা চালাকি দ্বারা জীবিকা অর্জন করে, তাহাদের সর্বদা বর্জন করিবে।' তিনি ইহা জানিতেন, তাঁহার মতো শ্রেষ্ঠ হিন্দু এ পর্যন্ত কেহ জন্মান নাই।" - **স্বামী বিবেকানন্দ**

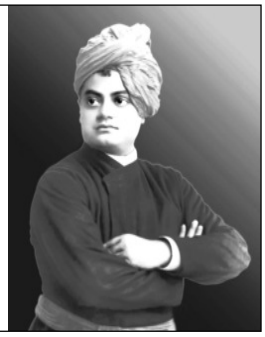

খ্রিস্ট দুষ্ট

দুর্গেশনন্দিনী

ভারতবর্ষে মধ্যযুগের ইতিহাস থেকে আমরা ইসলামী প্রভাবে হিন্দুদের অবস্থার কথা জানি এবং সে বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করি। কিন্তু তেমনি আধুনিক যুগে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের প্রভাবে এদেশের হিন্দুদের অবস্থা ঠিক কী হয়েছিল তা আমাদের আলোচনা করা একান্ত প্রয়োজন। আজ সে বিষয়ে আলোচনা সূচিত হল।

ষোড়শ সপ্তদশ শতকে পর্তুগিজরা বাংলায় ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে বসবাস করতে আরম্ভ করলে বাংলায় রোমান ক্যাথলিক খ্রিস্টধর্ম প্রচার আরম্ভ হয়। সপ্তগ্রাম, চট্টগ্রাম, ব্যান্ডেল, হুগলিতে পর্তুগিজরা বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ক্রমে এই সমুদয় স্থানে, বিশেষত হুগলিতে, বহু পর্তুগিজ ও ইউরোপিয়ানরা স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। পর্তুগিজরা মরুবাসীদের মতই দস্যু প্রকৃতির ছিল। যে এলাকায় বসবাস করত সেই এলাকার মানুষদের উপর অত্যাচার করত। এছাড়াও জোর করে এলাকাবাসীকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। তারা এই বলে গর্ব করতো যে সমস্ত প্রাচ্য ভূখণ্ডে তারা দশ বছরে যত ভারতীয়কে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে হুগলিতে এক বছরে তার চেয়ে বেশি লোক খ্রিস্টান হয়। কিন্তু শাহজাহানের হারেমের দুই বাঁদিকে অপহরণ করার ফলে 1632 খ্রিস্টাব্দে পর্তুগিজরা বিতাড়িত হয়। পর্তুগিজ মিশনারীরা ধর্ম প্রাচারের জন্য বাংলা শিখেছিল। এরপর বাংলা ভাষায় বিভিন্ন খ্রিস্টধর্ম রচনা করত। একটি কাহিনী প্রচলিত আছে যে, 1783 খ্রিস্টাব্দে রচিত "ব্রাহ্মণ রোমান ক্যাথলিক সংবাদ" গ্রন্থের রচয়িতা ডোম এন্টোনিও রোজারিও নামক খ্রিস্টধর্মান্তরিত এক বাঙালি হিন্দু ঢাকার নিকটবর্তী অঞ্চলে 200000 দরিদ্র ও অন্তজশ্রেণীর হিন্দুকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করে। কিন্তু কে এদের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে এই নিয়ে দুই পাদ্রীর মধ্যে বিবাদ সূচিত হয় এবং তার ফলে এরা সকলেই হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে। পূর্ববঙ্গে দরিদ্র শ্রেণীর কিছু মানুষ খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। ইংরাজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্বে বাঙালিদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রভাব খুব সামান্যই ছিল। তবে বহু পর্তুগিজ এই দেশের স্ত্রী লোকদের তুলে নিয়ে বা জোর করে বা ভালোবাসায় ভুলিয়ে বিবাহ করায় বৃহৎ একটি বাঙালি খ্রিস্ট সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। পর্তুগিজদের পরে ইউরোপ থেকে ওলন্দাজ ও

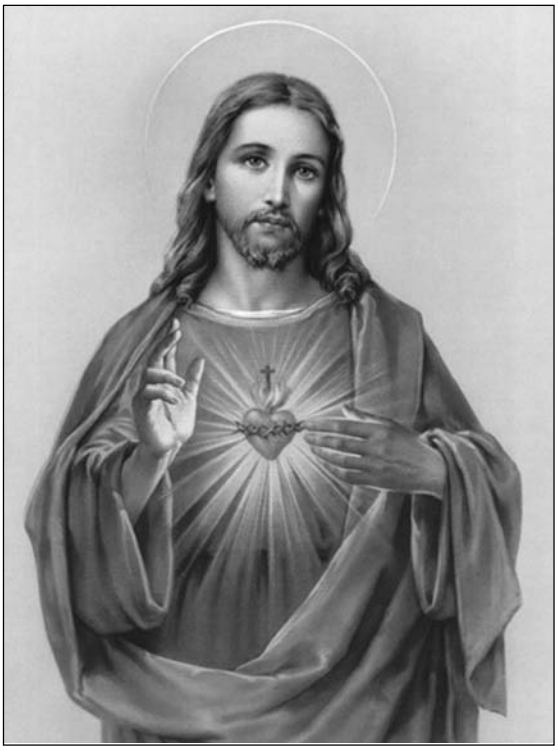

ইংরেজ কোম্পানি ভারতে এসে বাণিজ্যের প্রাধান্য বিস্তার ঘটায়। কিন্তু তারা ধর্মপ্রচারের বিপক্ষে ছিলেন। যে রাজকীয় সনদের বলে ইংরেজ বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে বাণিজ্য করবার অধিকার পেয়েছিল, তাতে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে তারা ভারতে কোনরকম ভাবে মিশনারী পাঠাতে পারবে না। এত বাধা সত্ত্বেও উইলিয়াম কেরি নামে একজন ইংরেজ পাদ্রী ডেন দেশীয় জাহাজে 1793 খ্রিস্টাব্দে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে কলকাতায় উপস্থিত হন। এই উইলিয়াম কেরি একজন দরিদ্র মুচির পুত্র ছিলেন এবং যথেষ্ট উৎসাহ ও অধ্যবসায় সত্ত্বেও ধর্ম প্রচারে সম্পূর্ণ বিফল হলেন। কিছুদিন পরে তাঁর আহ্বানে আরো চারজন ইংরেজ এক অ্যামেরিকান জাহাজে কলকাতায় পৌঁছলেন। কিন্তু ইংরেজ গভর্নর তাদের কলকাতায় নামতে না দেওয়ায় তার ডেন জানি অধিকৃত শ্রীরামপুর অঞ্চলে চলে গেলেন এবং কেরিও সেখানে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এই রূপে কলকাতার নিকটবর্তী শ্রীরামপুরে প্রোটেস্টান্ট খ্রিস্টান

মিশনারীদের একটি কেন্দ্র স্থাপিত হল। 1800 খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণচন্দ্র পাল নামে এক ছুতার মিস্ত্রির হাত ভেঙে গেলে টমাস নামে এক মিশনারি ডাক্তারের চিকিৎসায় সে আরোগ্য লাভ করে। সেই সর্বপ্রথম খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করে। এর পূর্বে সাত বছরের মধ্যেও একটি বাঙালি হিন্দুকেও কেউ খ্রিস্টান ধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। সুতরাং এই ঘটনায় সমস্ত মিশনারীরা আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে এবং টমাস উন্মাদের মতো আচরণ করতে শুরু করে। ফলে তাকে পাগল বলে আটক করে রাখা হয়। এদিকে বিলেতে একদল লোকের চেষ্টায় ভারতে ইংরেজ মিশনারিদের ধর্ম প্রচারে যে নিষেধাজ্ঞা ছিল 1814 রহিত করা হয়। সুতরাং শ্রীরামপুরের প্রোটেস্টান্ট মিশনারিদের ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র বাংলায় এবং বাংলার বাইরে বিস্তার লাভ করে। 1818 খ্রিস্টাব্দে 126টি দেশীয় ভাষা শিক্ষার বিদ্যালয়ের প্রায় 10 হাজার ছাত্র পড়ত। তারা সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বহু খ্রিস্টধর্ম শিক্ষা লাভ করত। 1821 খ্রিস্টাব্দে শ্রীরামপুরে কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। 1814 খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ব্যাপক হারে missionary এই বঙ্গে আসতে শুরু করে। কলকাতায় একজন পাদ্রী নিযুক্ত হলেন। এর ফলে প্রধানত বিদ্যালয়, হাসপাতাল এগুলির দ্বারা দরিদ্র শ্রেণীর হিন্দুরা প্রলুব্ধ হয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে শুরু করল। কিন্তু তাদের সংখ্যা খুব বেশি হয়নি। 1817 হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয় এবং 1835 সরকারি নতুন ব্যবস্থা ইংরেজি শিক্ষার প্রসারের ফলে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আশক্তি বৃদ্ধি পায়। মধুসূদন দত্ত, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে।

পূর্বে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃপক্ষ এদেশে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের বিরোধী ছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাদের মতো সম্পূর্ণ পরিবর্তন হল এবং কোম্পানির তরফ থেকে উৎসাহ দেওয়া হলো তাতে মিশনারিদের এদেশে বসবাস ও ধর্মপ্রচারের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করা হলো। ফলে মিশনারিরা এদেশে আসতে শুরু করল ও কর্মচারীগণ পরোক্ষভাবে হিন্দু ধর্মের সমর্থন করে আসছিল তার বিরুদ্ধে তারা বিরোধিতা করতে শুরু করল। এক্ষেত্রে বলে রাখি এর পূর্বে ইংরেজ সরকার পক্ষ থেকে, কিন্তু হিন্দু মন্দিরের ভার গ্রহণ করা, অনাবৃষ্টি হলে তার নিবারণের জন্য ব্রাহ্মণদের দ্বারা পুজো করানো, সরকারী দলিলপত্র শ্রীলেখা, গণেশ নাম উচ্চারণ করা, হিন্দুদের নানা ধর্মউৎসবে সরকারি কর্মচারীদের যোগদান দেওয়া এবং সেই উপলক্ষে শোভাযাত্রা সামরিক বাদ্য বাজানো, হিন্দু উৎসব উপলক্ষে কামান দাগা ইত্যাদি কার্যাবলীগুলো হতো। মিশনারিগণের আন্দোলনের ফলে বিলেতের কর্তৃপক্ষ আদেশ দিলেন যে সরকারি কর্মচারীরা ধর্ম বিষয়ে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ থাকবে। কিন্তু কার্যত এই সরকারি কর্মচারীরা খ্রিস্টান ধর্মের জন্য নানাভাবে মিশনারিদের সাহায্য করতে বাধ্য থাকবে। এ বিষয়ে উদার মতাবলম্বী রাজা রামমোহন রায় যা লিখেছিলেন তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য ঃ—''গত ২০ বছর যাবৎ ইংরেজ মিশনারিরা প্রকাশ্যে নানাভাবে হিন্দুদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করতে চেষ্টা করছে। প্রথমতঃ ছোট বড় নানা গ্রন্থ রচনা করে, এই ধর্মের নিন্দা করে হিন্দু দেবতা ও মহাপুরুষদের প্রতি গালিগালাজ করে, বক্তোক্তি করে তা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করছে। দ্বিতীয়তঃ এদেশীয় লোকের গৃহের সম্মুখে এবং রাস্তায় দাঁড়িয়ে নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠতা এবং অন্য ধর্মের হীনতা প্রচার করা। তৃতীয়তঃ নিম্ন শ্রেণীর লোককে অর্থলোভে বা অন্য কোন স্বার্থের আশায় খ্রিস্টান হলে তাদের ভরণপোষণও চাকরির ব্যবস্থা করা হবে, এইভাবে অপরকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণের উৎসাহ দান।''

সত্যি বটে যিশুখ্রিস্টের শিষ্যরা নানা দেশে ধর্ম প্রচার করত। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে তারা ওই সমুদয় দেশে রাজত্ব করত না। যদি ইংরেজ মিশনারীরা তুরস্ক, পারস্য ইত্যাদি অধিক নিকটবর্তী যেসব দেশ ইংরাজ ও খ্রিস্ট অধীন নয়, সেই দেশে ধর্ম প্রচার করতো তাহলে বুঝতাম যে, যিশুর অনুচরগণের ন্যায় ধর্ম সাধনাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু যে বাংলা তথা ভারতে ইংরেজ রাজা এবং ইংরেজের নামে ভয়ে মানুষ কম্পমান সেই দেশের দরিদ্র ভীরু অধিবাসীদের ধর্ম বিষয়ে স্বাধীন অধিকারে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ ভগবান বা মানুষের কাছে ন্যায়সঙ্গত বলে বিবেচিত হবে না। কারণ জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরা তাদের অপেক্ষা কম শক্তিশালী কারো মনে আঘাত দেওয়া অন্যায় মনে করেন বিশেষত এই সমস্ত দুর্বল লোকেরা যদি তাদের অধীনস্থ হয় তবে তারা এদের কষ্ট দেওয়ার কথা কল্পনাও করতে পারেন না। মিশনারিরা হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন তা রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ প্রণীত একখানি গ্রন্থে নিম্নলিখিত উক্তিতে তা বোঝা যাবে ঃ ''অধঃপতিত মানবের কুবুদ্ধি হইতে যে সকল অসত্য ধর্মমতের উদ্ভব হয়েছে তার মধ্যে হিন্দুধর্ম সর্বাপেক্ষা বিশাল। জগতে যত মিথ্যা দ্বন্দ্ব আছে তাদের মধ্যে হিন্দু ধর্মই সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণ এবং অধিকারে প্রকারে ভগবানের প্রচারিত সত্যের বিরোধী মত ও উক্তি স্থান পেয়েছে।'' মিশনারিদের বিদ্যালগুলি যে প্রধানত খ্রিস্টধর্ম প্রচারের কেন্দ্র রূপে কল্পিত হয়েছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 1822 সালে এই ইংরেজি পত্রিকায় লেখা হয়েছে ''যে সমস্ত ছাত্ররা এখন পুতুল পূজার ন্যায়

অপবিত্র গর্হিত আচরণে অভ্যস্ত, তারা এই বিদ্যালয়ের শিক্ষার অভাবে ভগবান ও তার প্রেরিত যিশু সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করবে।" মিশনারি বালিকা বিদ্যালয়গুলিতেও প্রকাশ্যে খ্রিস্টধর্মের শিক্ষা দেওয়া হতো। হিন্দু ছাত্রীদের অন্নপূর্ণা, বিষ্ণুপ্রিয়া ইত্যাদি নাম উল্লেখ করে একজন মিশনারি মন্তব্য করেছেন ''ব্যাভিচারিণী, ইন্দ্রিয়পরায়ণ যেসব কাল্পনিক দেবীর যেসব ক্রূরতা ও কামুকতার কুৎসিত কাহিনী হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থেই লিপিবদ্ধ আছে তাদের নামে পিতামাতারা যে সন্তানের নাম রেখেছেন তাদের নিকট সৎ আচরণ কি করে প্রত্যাশা করা যায়।"

মিশনারিরা যে ছলে-বলে তরুণ বালকদেরকে খ্রিস্টান করতেন এর অভিযোগ সে সময়ের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতো। 1822 খ্রিস্টাব্দের 6 জুলাই ''সমাচার চন্দ্রিকা''-এ এক পত্র প্রেরক লিখেছিলেন যে, তাকে না জেনে তার পুত্র মিশনারি স্কুলে পড়ছে এই সংবাদ পেয়ে তিনি তার পুত্রকে বাড়িতে আটকে রেখে ছিলেন। পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে তার উক্তি উদ্ধৃতি করছি ঃ

''কিঞ্চিৎ কাল পরে অপকৃষ্ট ক্রিষ্টা বান্দা নামক পাতি ফিরিঙ্গি একজন গত স্নানযাত্রা দিবসে আমার বোন হুগলির বাড়িতে যাইয়া ওই ১৪ বৎসর বয়স্ক বালককে ছল করিয়া আনিয়া বগি গাড়িতে আরোহণ করাইলো। বালক শিক্ষকের বশীভূত হইয়া তৎসমভিব্যাহারে গেল তখন আমার গৃহে পুরুষমাত্র ছিল না। কিন্তু যখন কলিকাতা অভিমুখে বগি চলিতে লাগিল তখন বালক শীৎকার ধ্বনি করিয়া গ্রামের লোককে কহিল 'তোমরা আমার পিতাকে সংবাদ দিবা আমাকে ক্রিস্টো বান্দা ধরিয়া লইয়া যায়। তৎপরে কয়েক দিবস আমি তত্তকরত ওই পাঠশালায় আছে জানতে পারিয়া বাটী মধ্যে প্রবিষ্ট হওনের চেষ্টা করিলাম। কোনোমতে প্রবিষ্ট হইতে পারিলাম না। পরে পোলিশে নালিশ করিলাম, কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তাতে মনোযোগ করিলেন না। আমার বালককে ছাড়িয়া দিতে হুকুম দিলেন না।" এরপরে তিনি লিখেছিলেন যে, মিশনারিরা এই প্রকার দৌরাত্ম্য করছে এবং এরম আরো চারটি বালককে অপহরণ করে খ্রিস্টান করেছে তাদের নাম ও পরিচয় দিয়ে হিন্দুদের মিশনারিদের দমনের চেষ্টা করতে উপদেশ দিয়েছেন। ডাফ সাহেব তার যেসব পরবন্ধ ও গ্রন্থে হিন্দুধর্ম সম্পর্কে পূর্বলিখিত নিন্দাবাদ করেছেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় তাঁর তীব্র প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়। তাঁর স্কুলের একজন ছাত্র ও তার স্ত্রী খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করায় কলকাতায় তুমুল আন্দোলন হয়েছিল এবং স্বয়ং দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে হিন্দুগণ খ্রিস্টান করার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, তাদের চেষ্টা সফল হয়েছিল বলপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেবার দৃষ্টান্ত এরপর থেকে অনেক কমে গিয়েছিল। মিশনারিদের বিদ্যালয়গুলোই এরূপ ধর্মান্তর গ্রহণের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এর ফলে 1845 সালে একটি স্কুল স্থাপিত হলো। হিন্দুরা ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণে সচেষ্ট হয়ে উঠলো। হিন্দু ছাত্র এখানে বিনা বেতনে পড়তে পারত।

কিন্তু শত চেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চ-মাধ্যমিক এবং মধ্যবিত্ত হিন্দুদের উপর খৃষ্টধর্ম বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

সাভারকার এর রচনাতে হিন্দুদের উপর মুসলিমদের অত্যাচারের কথা যেমন রয়েছে তেমনি আছে হিন্দুদের ওপর খ্রিস্টান আক্রমণের কাহিনী। তিনি ''খ্রিস্টানদের হিন্দু বিরোধী অভিযানের শুরু'' গ্রন্থে লিখেছেন যে, খ্রিস্টীয় পুরাণ অনুসারে প্রথম শতাব্দীতে সিরিয়াতে যখন খ্রিস্টান ধর্ম প্রচার শুরু হয় তখন ইহুদিরা নাজারেথের যিশু যে ক্রূশবিদ্ধ করেছিল এবং জোর করে ইহুদী ধর্ম বিনষ্ট করার প্রতিবাদে তারা খ্রিস্টানদের উচিত শিক্ষা দিতে শুরু করেছিল। এই সময় তারা ভারতে আসার পথের কথা জানত, তাই তারা ভারতে পালিয়ে আসে এবং জামরিয়ার রাজার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করে।" হিন্দু রাজার পক্ষেই বিদেশীদের উপর কোন শর্ত আরোপ না করে নিজের উপকূলে নামতে দেওয়া সেদিন উচিত হয়নি। কিন্তু হিন্দু জাতি সদ্গুণ সমূহের বিকৃতির যে ব্যধিতে ভুগছে তা থেকে সেদিনের মালাবার সম্রাটও মুক্ত ছিলেন না। তিনি তাঁর রাজ্যের একটি এলাকায় এই সিরিয়ান খ্রিস্টানদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি তাদের গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিতর এক স্বতন্ত্র জাতি রূপে বসবাসের অধিকার দিয়ে তাম্রপত্র লিখে দিলেন। ধীরে ধীরে এই সিরিয়ান খ্রিস্টানরা লক্ষ্য করলো যদি হিন্দুদের কেউ তাদের সঙ্গে পানভোজন করে তাহলে সে জাতিচ্যুত হচ্ছে। দেখে শুনে তারা নিজ মূর্তি ধারণ করল এবং এই সুযোগ নিয়ে ধীরে ধীরে খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের অশুভ উদ্যোগ শুরু করল।

প্রথম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে একজনও খ্রিস্টান ছিল না। কিন্তু ভারতে হিন্দুদের কপটতা পূর্বক খ্রিস্টানিকরণ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ইংল্যান্ডে খ্রিস্টান ধর্ম কিভাবে প্রচারিত হয়েছিল তা হিন্দু মাত্রই পাঠ করা উচিত। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, শত্রুর ধর্মান্তর অভিযান পরিচালনায় পোষকতা করার মতো সুযোগ আমাদের ধর্মে প্রায় 2000 বছর আগে থেকে বিদ্যমান ছিল। এই সব সিরিয়ান খ্রিস্টান মিশনারিরা লক্ষ্য করেছিল কোন

একটি অঞ্চলে হিন্দুরা একটি সরোবর পবিত্র গণ্য করে সেখানে স্নান করে, জলপান করে। তাদের মনে এই ধারণা জন্মেছিল, হিন্দুরা যখন খ্রিস্টানদের সঙ্গে পানভোজন করলে নিজেদের ধর্মভ্রষ্ট বলে গণ্য করে, তবে ওই স্থানেও তারা সেই সুযোগ নিয়ে সব হিন্দুদের ধমভ্রষ্ট করে খ্রিস্টান করতে পারবে। এই চিন্তা করে তারা হিন্দুদের দ্বারা ব্যবহৃত সরোবরে গোপনে যেতে শুরু করল এবং সেখানে স্নান ও জল পান করতে শুরু করল। তারপর কিছুদিন অতীত হলে মিশনারিরা হিন্দু সমাবেশে বক্তৃতা দিতে শুরু করলো। তারা বলল, 'হিন্দুরা, তোমরা দেখো আমর হচ্ছি খ্রিস্টান, হিন্দু নই। তোমাদের সঙ্গে ওই একই সরোবরে স্নান করছি, তার জল ব্যবহার করছি। আমাদের খ্রিস্টান দেবতা উপাসনা করে আমরা আমাদের প্রভুর চরণোদক পান করছি আর সেই জল তোমরাও শ্রদ্ধাভরে পান করছো। ফলত তোমাদের হিন্দুধর্ম অনুযায়ী তোমরা যারা সেই জল পান করছ, তারা খ্রিস্টান হয়ে গেছ। তোমাদের ধর্মে সে কথা বলা থাকে। কাজেই তোমরা সকলেই খ্রিস্টান হয়ে গিয়েছো। তোমাদের জন্য ভাইরা যাতে প্রবঞ্চিত না হয়, তার জন্য আমাদের মতো ধার্মিক খ্রিস্টানরা ওই সত্য প্রচার করে দিলাম। এ সংবাদ বিভিন্ন গ্রামে অল্পকালের মধ্যে প্রচারিত হয়ে যাবার পর হইচই শুরু হয়। অন্যান্য হিন্দুদের ধর্ম বর্ণ হতে বহিষ্কৃত হয় খ্রিস্টান গ্রাম শহর বলে গণ্য হতে শুরু করে। সেন্ট জেভিয়ার নামে একজন ওইসব অঞ্চলে খ্রিস্টানীকরণে এমনই সকল সফল হয়েছিল, এটা কি তাতে সে বিশেষ আনন্দিত হয়েছিল। এ বিষয়ে সাভারকার লিখেছিলেন, 'যে কোন মিশনারিকে দেখতে পেলে হিন্দুরা গ্রাম ছেড়ে এদিক ওদিক পালাতো। যেসব হিন্দুরা খ্রিস্টান হতে অস্বীকার করতো তাদের উপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হতো। ফলে বহু হিন্দু মঠাধীশ, পুরোহিতরা নিজও নিজও বিগ্রহকে নিয়ে গোয়া ছেড়ে পলায়ন করে। সেন্ট ফ্রান্সিস জেভিয়ার 1543 খ্রিস্টাব্দে সোসাইটি অফ রোমের নিকট লিখেছিল, 'আমি যেখানে মূর্তিপূজার সংবাদ পাই সেখানে একদল ছেলেকে নিয়ে যাই। তারা সেই মূর্তিপূজা ও পুরোহিত ও অন্যান্যদের অপমানজনক কথা বলে গালি দিয়ে অতিষ্ঠ করে তোলে। ছেলেরা পরে সেদিকে ছুটে যায় ও থুথু দিয়ে পূজা স্থল অপবিত্র করে তোলে।' রোমে লেখেন, ''কোচিন থেকে 27শে জানুয়ারি 1543 খ্রিস্টাব্দে পুনরায় সবাই ধর্মান্তরিত হয়, তখন আমি তাদের মিথ্যা দেবতা মন্দির ভেঙে ফেলার নির্দেশ দিই।" জে. সি. ব্যারেন্ট নামক জনৈক গোয়ানিজ ঐতিহাসিক লিখেছেন, ''শান্তি ও প্রেমের ধর্ম এর নামে ইউরোপের যে নিষ্ঠুরতার সহকারে ইনকুইজিশনের অনুষ্ঠিত হতো ভারতে তার থেকে বহুগুণে বেশি নিষ্ঠুর আচরণ প্রদর্শিত হয়েছিল।" ইনকুইজিশনের বিচারকদের একটি কথাই হচ্ছে মৃত্যুদণ্ডের নামান্তর। তাদের একটি অঙ্গুলিহেলনে সমগ্র এশীয় অঞ্চলে বিরাট জনতার মাঝে আতঙ্ক নেমে আসত। তারা অত্যন্ত তুচ্ছ অজুহাতে মানুষের উপর ভয়াবহ নির্যাতন করত কিংবা জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতো। ইনকুইজিশন কি ভয়াবহ জিনিস তা নিশ্চয়ই অধিকাংশ পাঠকই জানেন। স্পেনের ইনকুইজিশন তো ভুবনবি(কু)খ্যাত। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না যে এই উপমহাদেশেও ইনকুইজিশন ছিল আর সেটি ছিল গোয়ায়। পাঠক অনুমান করতে পারেন কে এই ইনকুইজিশনের উদ্যোক্তা? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন তিনি আর কেউ নন, সেন্ট জেভিয়ার। ভারতবর্ষে এসে তিনি বুঝতে পারেন খ্রিস্টধর্ম এখানের মানুষের মনে কোন স্থায়ী জায়গা করে নিতে পারে নি। বেশিরভাগই জোর-জবরদস্তির ফলে বা রাজনৈতিক কারণে খ্রিস্টান হয়েছে। পুরনো ধর্ম ও রীতি-নীতির প্রতি এদের রয়েছে গভীর আকর্ষণ। তাই এদেরকে প্রকৃত খ্রিস্টান করে গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন ইনকুইজিশনের মতো ভয়ঙ্কর ও কার্যকরী ব্যবস্থা। তাই তিনি 1545 সালের 16 মে পর্তুগালের রাজাকে চিঠি লেখেন ঃ ''**খ্রিস্টানদের জন্য দ্বিতীয় জরুরী জিনিসটি হচ্ছে এখানে যেন পবিত্র ইনকুইজিশন স্থাপন করা হয় কারণ এখনও অনেকেই ইহুদি এবং মুসলিম আইন অনুসারে জীবনযাপন করছে। তাদের মনে ঈশ্বরের কোন ভয় নেই বা কোন চক্ষুলজ্জাও নেই। যেহেতু এই দুর্গের বাইরে এমন অনেকেই রয়েছে তাই প্রয়োজন পবিত্র ইনকুইজিশন ও প্রচুর ধর্মপ্রচারকদের। রাজা যেন তার ভারতের বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসী প্রজাদের জন্য এইসব জরুরী জিনিসের ব্যবস্থা করেন।**" পর্তুগালের রাজা ও পোপের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকার কারণে ইনকুইজিশন তখনই স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, কিন্তু জেসুইটদের অব্যাহত চাপের ফলে 1560 সালে এর কার্যক্রম শুরু হয়। যদিও এর শিকার হয় স্থানীয় হিন্দু, মুসলিম, ইহুদি সবাই। খ্রিস্টান যাজকেরা প্রতিটি পাড়ায় নজরদারি করে বেড়াতেন ও কাউকে বিন্দুমাত্র সন্দেহ হলে ধরে এনে অকথ্য নির্যাতন চালানো হত। এমনকি অনেক ইউরোপিয়ানকেও ইনকুইজিশনের শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। এদের মধ্যে একজন হলেন ফরাসি পরিব্রাজক ডাক্তার চার্লস ডেলন যিনি 1674 থেকে 1677 সাল পর্যন্ত ইনকুইজিশনে বন্দী ছিলেন। তিনি তার এই কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেছেন তার লেখা বইয়ে। তার এই বর্ণনার কথা উঠে এসেছে ডক্টর ক্লডিয়াস বুকাননের লেখা Christian Research In

India বইয়েও যা প্রদর্শিত হয় 1812 সালে। উল্লেখ্য যে, 1860 থেকে 1812 সাল পর্যন্ত এই গোয়া ইনকুইজিশন চলে। বুকানন 1808 সালে গোয়া যান এবং স্বচক্ষে দেখেন ইনকুইজিশনের সুবিশাল হল, বিচারকক্ষ, বন্দীশালা এবং যেখানে বন্দীদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হত। কিন্তু ঠিক কত লোককে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল বা অন্যান্য শাস্তি দেওয়া হয়েছিল তার সঠিক কোন রেকর্ড পাওয়া যায় না। এ বিষয়ে সমস্ত নথিপত্র ক্যাথলিক চার্চ খুবই সতর্কতার সঙ্গে গোপন করে গেছে। 1812 সালের 10 ডিসেম্বর গোয়ার ভাইসরয় পর্তুগালের রাজার কাছে ইনকুইজিশন সংক্রান্ত নথিপত্র পুড়িয়ে ফেলার আবেদন জানিয়ে একটি চিঠি লেখেন। তাকে একাজ করতে নিষেধ করা হয় এবং টমাস নরিনহো নামে একজন পাদ্রীকে নিয়োগ দেওয়া হয় উক্ত নথিপত্র থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করতে। পরে ওই নথিপত্রের কি হয় তা আর জানা যায়নি। তবে স্পেন ও পর্তুগাল ইনকুইজিশনের রেকর্ডের সঙ্গে তুলনা করে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রচুর মানুষ কত নিচে নামতে পারে। গোয়া ইনকুইজিশন সম্পর্কে বিশ্বখ্যাত মনীষী ও মুক্তচিন্তক ভলতেয়ারের একটি উক্তি রয়েছে যা—"Goa is sadly famous for its Inquisition, equally contrary to humanity and commence. The portuguese monks made us belileve that the people worshipped the devil, and it is they who have served him." সেন্ট জেভিয়ার্স এবং তার পরবর্তী পাদ্রীরা হিন্দুদের উপর দীর্ঘকাল ধরে কী অবর্ণনীয় অত্যাচার করেছিল তা লেখক এই গ্রন্থে স্থানাভাবে উল্লেখ করতে পারেনি বা হয়ত চাননি। কারণ গ্রন্থটি ভারতের ইতিহাস নয়, ইতিহাসের সমীক্ষা মাত্র।

গ্রন্থকার ওই কথা বলার পর আরো বলেছেন, ''উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুদের শুধু মুসলিম অত্যাচার ও ধর্মীয় আক্রমণের মোকাবিলা করতে হয়েছিল। কিন্তু বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ থেমে রামেশরম অবধি হিন্দুদের তৎকালীন দক্ষিণ ভারতের পাঁচটি মুসলমান রাজ্যের নির্মম অত্যাচার করা ছাড়াও, তাদের চাইতে অধিক ও নিষ্ঠুর ও বর্বর নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল।

খ্রিস্টান করার জন্য তাদের অত্যাচার ছিল সীমাহীন। সেই হৃদয়বিদারক কাহিনী কেউ পাঠ করতে চাইলে ডক্টর এন্ডনীও নারোহা রচিত 'Os Hindus De Goa Republica Porty Guese' গ্রন্থ পাঠ করে দেখবেন। ইতিহাসে পর্তুগিজ পাদ্রীদের ভয়াবহ অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। সেসব কাহিনীর কাছে মুসলিম অত্যাচারের কাহিনী ম্লান হয়ে যায়। 1544 সালে ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের রাজপুত্রদের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে ঝগড় শুরু হয়। প্রত্যেকেই পর্তুগিজদের সাহায্য চাইছিল জেতার জন্য। তখন গোয়ার গভর্নর জেভিয়ারকে কুইলনের তিরুবতী রাজার সভায় নিযুক্ত করেন। রাজা বলেন যে পর্তুগিজদের সাহায্যের বিনিময়ে তিনি আর্থিক অনুদান ও মালাবার উপকূলের জেলেদের ধর্মান্তরিত করতে দিতে রাজি আছেন। জেভিয়ার এতে রাজি হয় ও মালাবার উপকূলে চলে আসে। যেসব জেলেরা ধর্মান্তরিত হতে রাজি হয়নি বা পরে ধর্মত্যাগ করে তাদের হুমকি দেয়া হয় যে পর্তুগিজরা তাদের নৌকা আটক করে রাখবে এবং মাছ ধরতে দেবে না। অন্যদের ভয় দেখাবার জন্য কয়েকজনের উপর এই শাস্তি প্রয়োগও করা হয়। এখানেও জেভিয়ার আগের মতই ভয়ানক মূর্তি ও মন্দিরবিদ্বেষী ভূমিকা রাখেন। গরিব জেলেরা এসবের প্রতিবাদ করতে পারত না, কারণ এই সাধুকে সাহায্য করার জন্য তার পর্তুগিজ জলদস্যু বন্ধুরা হাতের কাছেই ছিল। জেভিয়ার যে এসব কাজে প্রচুর আনন্দ পেতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় 1545 সালের 8 ফেব্রুয়ারি, ''the Society of Jesus" সংঘের প্রতি তার লেখা চিঠিতে—**''দীক্ষাস্নান হওয়ার পরে নব্য খ্রিস্টানেরা ঘরে ফিরে যায় এবং তাদের স্ত্রী ও পরিবারকে নিয়ে আসে তাদের দীক্ষিত করার জন্য। সবাইকে দীক্ষিত করার পর আমি নির্দেশ দেই মিথ্যা দেবতাদের মন্দিরগুলি ধ্বংস করার জন্য ও মূর্তিগুলি ভেঙে ফেলার জন্য। আমি ভাষার প্রকাশ করতে পারবো না আমার কেমন আনন্দ হয় যখন আমি দেখি যে যারা একসময় এসব মূর্তির উপাসনা করত তারাই এখন এসব মূর্তি ভাঙছে।"**

ধর্মপ্রচারের এই ''মহান" কাজে জেভিয়ারের সহযোগী ছিলেন রোম কর্তৃক নিযুক্ত ভারতের ভিসার জেনারেল (ধর্মরক্ষক) মিগুয়েল ভাস। জেভিয়ারের সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি 1545 সালের নভেম্বরে পর্তুগালের রাজার কাছে এক বিশাল চিঠি লেখেন। এতে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের জন্য 41 দফা পরিকল্পনা ছিল। এর মধ্যে 3 নম্বর দফাটি হল—**''আমরা সবাই যেহেতু জানি যে পৌত্তলিকতা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে এক জঘন্য অপরাধ তাই এটাই উচিত হবে যে আপনার রাজ্যের কোন এলাকায় এমনকি সমগ্র গোয়ায় যেন কোন প্রকাশ্য বা গোপন মন্দির না থাকে এবং মন্দির তৈরি করার জন্য কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়। কোন কর্মচারী যেন কোন ধরণের মূর্তি তৈরি করতে না পাবে, তা পাথর, কাঠ, তামা বা অন্য যেকোনো ধাতুই হোক না কেন...এবং সেন্ট পল'স কলেজের**

দায়িত্বে যারা আছে তাদেরকে যেন ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য হিন্দুদের ঘর তল্লাসি করার ক্ষমতা দেয়া হয় যদি তাদের এমন সন্দেহ হয় যে ওইসব ঘরে মূর্তি আছে।" (Joseph Wicki, Documenta Indica, Vol.1) এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে রাজা 1547 সালের 8 মার্চ গোয়ার ভাইসরয়কে নির্দেশ দেন সমস্ত মন্দির ভেঙে ফেলতে। তবে মন্দির ধ্বংসের এই প্রক্রিয়া যে আগে ছিল না এমন কিন্তু নয়। খ্রিস্টান যাজক ও পুরোহিতরা নিজ উদ্যোগেই স্ব স্ব এলাকার মন্দির ধ্বংস করতে উৎসাহী ছিলেন। শুধু 1541 সালেই ধ্বংস হওয়া 156টি মন্দিরের তালিকা পাওয়া যায় Tomba da llha des Goa a das Terras de Salcete e Bardes বইটিতে যার লেখক Francisco Pais আর বইটি প্রকাশিত হয় 1952 সালে। তবে রাজার আদেশের পর ধ্বংস প্রক্রিয়া নতুন গতি লাভ করে। History of Christianity of India, Vol.1 অনুযায়ী সালসেতে ২৮০টি মন্দির ও বারদেজে ৩০০টি মন্দির ধ্বংস করা হয়। বাসেইন, বান্দ্রা, থানা এবং বোম্বেতে ধ্বংস করা মন্দিরের কোন হিসেব পাওয়া যায় না। তবে মিশনারি নথিপত্রে বেশ কিছু মন্দিরকে গির্জায় পরিবর্তিত করার উল্লেখ পাওয়া যায়। সেভিওন এবং নেভেন দ্বীপে অনেক মন্দির পুড়িয়ে দেয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। এমনকি কারো বাসায় দেব-দেবীর ছবি বা মূর্তি রাখাও নিষিদ্ধ ছিল এবং নিষেধ অমান্যকারীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হত। শুধু তাই নয়, পর্তুগিজ এলাকার বাইরে কোন মন্দিরে আর্থিক অনুদান দিলে বা তীর্থযাত্রায় গেলেও প্রচুর জরিমানা দিতে হত ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা হত।

স্থানীয়দের উপর চাপানো বৈষম্যমূলক আইনগুলি কেমন ছিল তার কিছু উদাহরণ নিচে দেয়া যেতে পারে ঃ

১) ব্রাহ্মণদের বন্দী ও ক্রীতদাস করা হত বা নির্বাসন দেয়া হত।

২) যেসব হিন্দুরা ধর্মান্তরের ভয়ে তাদের পরিবার-পরিজনকে অন্য এলাকায় পাঠিয়ে দিত তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত।

৩) হিন্দু রীতি-নীতি ও উৎসব পালন নিষিদ্ধ ছিল।

৪) হিন্দু পুরোহিত ও যাজকদের শাস্ত্রীদের ক্রিয়াকর্ম করা নিষিদ্ধ ছিল।

৫) হিন্দুদেরকে গির্জার ভাষণ শোনার জন্য বাধ্য করা হত।

৬) পারিবারিক ঐতিহ্য ও সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হত।

৭) অনাথ হিন্দু শিশুদের জোরপূর্বক ধর্মান্তরিত করা হত।

৮) হিন্দুদের ঘোড়ায় বা পালকিতে চড়া নিষিদ্ধ ছিল।

উপরোক্ত বৈষম্যমূলক নিয়মগুলি অন্যান্য স্থানীয় অখ্রিস্টান অধিবাসীদের জন্যও প্রযোজ্য ছিল তবে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও পৌত্তলিক হওয়ায় হিন্দুদের উপর এর প্রভাব সবথেকে বেশি পড়েছিল। একইভাবে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের দেয়া হত নানা সুযোগ-সুবিধা। তাদের ভূমি কর ১৫ বছরের জন্য মকুব করে দেয়া হত। সরকারি উচ্চপদগুলিতে তাদের নির্বিচারে নিয়োগ দেয়া হত। এভাবে ধর্মকে ব্যবসার মতো লাভজনক করে তুলেছিল জেভিয়ার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা।

ভারতবর্ষের এই সাফল্যের পর জেভিয়ার এবার প্রাচ্যের অন্যান্য দেশগুলির দিকে নজর দেয়। সে 1545 সালের সেপ্টেম্বর মালাক্কায় আসে এবং পরবর্তী দুবছর পাশ্ববর্তী এলাকায় ধর্মপ্রচার করে। এখানেই তার দেখা হয় একজন জাপানী পলাতক খুনের আসামী আনজিরোর সঙ্গে। আনজিরো খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং জেভিয়ারকে বোঝায় যে জাপানের ধর্ম খ্রিস্টধর্মের মতোই ও জাপানীরা খুব সহজেই যিশুকে গ্রহণ করবে। জেভিয়ার তাকে 1548 সালে গোয়ায় নিয়ে আসেন এবং মিশনারি হিসেবে প্রশিক্ষণ দেন। দাগী আসামীদের নিজের স্বার্থে ব্যবহার করা চার্চের বহু পুরনো কৌশল। যাই হোক, জেভিয়ার এবং আনজিরো দীর্ঘযাত্রা শেষে জাপানের কোগোশিমা বন্দরে এসে পৌঁছায়। তখন জাপান প্রায় 250 জন জমিদারের অধিকারে ছিল যাদের উপর মিয়াকোর সম্রাটের তেমন কোন নিয়ন্ত্রণ ছিল না। তারা উদীয়মান পর্তুগিজ শক্তির ব্যাপারে শুনেছিল এবং তাদের অনেকেই স্থানীয় যুদ্ধ বিগ্রহ পর্তুগিজদের সাহায্য নিশ্চিত করতে চাইতেন। এদেরই একজন জেভিয়ারকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং তাকে স্বাধীনভাবে ধর্মপ্রচারের অনুমতি দেন। কিন্তু ভারতের মতো জেভিয়ার এখানে খুব একটা সুবিধা করতে পারছিল না কারণ তার পর্তুগিজ জলদস্যু বন্ধুরা না থাকায় তিনি ইচ্ছেমত জাপানীদের গণহারে ধর্মান্তরিত করতে পারছিলেন না। তাদেরকে হুমকি ধমকি দেয়া বা শাস্তি দেয়া তার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না কারণ সে নিজেই জমিদারের অনুগ্রহে বাস করছিলেন। তাছাড়া সে বুঝতে পেরেছিল যে আনজিরো তাকে ভুল বুঝিয়েছে। জাপানে বৌদ্ধধর্ম ও প্রাচীন শিনতো ধর্মের সংমিশ্রণে যে ধর্ম চালু হয়েছিল তা তার খ্রিস্টধর্ম থেকে হাজার মাইল দূরে ছিল। স্থানীয় বৌদ্ধ ও শিনতো পুরোহিতরাও সংঘবদ্ধ এবং সতর্ক ছিল যাতে জেভিয়ার জাপানীদের ধর্মান্তরিত করতে না পার। জেভিয়ার তখন তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে তাদের হুমকি দিতে থাকে যে বুদ্ধ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান আর যারা তার উপাসনা

করে তারা পৌত্তলিকতার মত চরম ঘৃণ্য অপরাধ করার কারণে অনন্তকাল নরকের আগুনে পুড়বে। জাপানীরা জেভিয়ার ও তার ধর্মকে নতুনভাবে চিনতে পারল এবং তার বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তোলা হল। জেভিয়ার অবস্থা বেগতিক থেকে মিয়াকোর সম্রাটের কাছে গেলেন তাকে ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রস্তাব দেয়ার জন্য। কিন্তু সম্রাট তার নিজের ধর্মে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং জেভিয়ারের মতলব বুঝতে পেরে তার সঙ্গে দেখা করতে অস্বীকৃতি জানান। জেভিয়ার ভগ্নহৃদয়ে 1551 সালে গোয়ায় ফিরে আসে। যে অল্প কয়েকজন জাপানীকে তার ভ্রমণকালে চীনের কথা অনেক শুনেছিলেন এবং জাপানের ব্যর্থ অভিযানের পর সিদ্ধান্ত নেন চীনে ধর্মপ্রচার করার। সেজন্য তিনি 1552 সালে চীনের উদ্দেশ্যে রওনা হন। কিন্তু চীনের মূলভূমিতে পৌঁছানোর আগেই সে কুয়ানতাং বন্দরের অনতিদূরে একটি রুক্ষ পাথুরে দ্বীপে ওই বছরেরই 2 ডিসেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর সময় তার সঙ্গে ছিল শুধুমাত্র একজন চীনা ভৃত্য। 1553 সালের 14 মার্চ তা গোয়ায় ফিরিয়ে আনা হয়। তাকে প্রথমে সেন্ট পল গির্জায় ও পরে বম জেসাস গির্জায় সমাহিত করা হয়। রোম 1664 সালে তাকে সেন্ট উপাধিতে ভূষিত করে।

তার মৃতদেহ একটি কাঁচের কফিনে রাখা আছে যা বিভিন্ন ধর্মীয় উৎসবের সময় প্রদর্শনীর জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়। খ্রিস্টান অখ্রিস্টান নির্বিশেষে গোয়ার সাধারণ মানুষ তাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করে এবং বিপদে-আপদে তার অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। কিন্তু তারা কি একবারও ভেবে দেখেছে, এই মানুষটির কারণে তাদের পূর্বপুরুষদের কতটা অত্যাচার ও পাশবিকতার শিকার হতে হয়েছে? 1560 থেকে 1812 সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ 252 বছরে যত নিরপরাধ মানুষকে ইনকুইজিশনের আগুনে প্রাণ দিতে হয়েছে, বন্দীদশা বরণ করতে হয়েছে বা অন্যান্য নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের কান্না কি এইসব অন্ধভক্ত যারা তাদেরই বংশধর তাদের কানে পৌঁছায় না? এত কিছুর পরেও চার্চ জেভিয়ারকে ত্যাগ করেনি বা তার কর্মকাণ্ডের বিন্দুমাত্র নিন্দা করেনি বরং তাকে সেন্ট (সাধু) হিসেবে আখ্যা দিয়েছে, নানা উপাধিতে তাকে ভূষিত করেছে এবং প্রতিষ্ঠানের পর প্রতিষ্ঠান তার নামে উৎসর্গ করেছে। এতেই বোঝা যায় চার্চের কাছে সাধুতার সংজ্ঞা শুধু যেন তেন উপায়ে কার্যসিদ্ধি করা তথা নিজের সাম্রাজ্য ও বাহুবল বাড়ানো। গির্জার সাধুদের অনেকেই যেকোনো সাধারণ মানুষের থেকেও বেশি অসাধু। এদের অনেকেই উপবাস করা, খালি পায়ে হাঁটা, নিজেকে চাবুক মারা, নারীসঙ্গ বর্জন ইত্যাদি নানা ধরণের আত্মপীড়ন করে বেড়াতেন। কিন্তু যা এদের ছিল না তা হল উদার মানবতাবাদী বৈশ্বিক চেতনা। অযৌক্তিক ও মানবতাবিরোধী ধর্মীয় বিশ্বাসগুলি যে মানুষকে কতটা পাষণ্ড ও অমানুষ করে তুলতে পারে তার অনুপম নিদর্শন হচ্ছে সেন্ট জেভিয়ার। কিন্তু এই সমুদয় অপচেষ্টা সত্ত্বেও উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত হিন্দুদের ওপর খ্রিস্টধর্ম বিশেষ কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই বীভৎস ইতিহাস পরে এখনো যদি জাতি, ভাষা, বর্ণ, প্রাদেশিকতাকে বর্জন করে হিন্দু জাতি ঐক্য বদ্ধ না হয়, তাহলে পুনরায় রিফিউজি তকমা পাবার জন্য তৈরি হোক।

তথ্যসূত্র ঃ

ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ্ব বাংলাদেশের ইতিহাস
বীর সাভারকার ঃ্ব খ্রিস্টানদের হিন্দু বিরোধী অভিযানের শুরু
হিন্দু রক্ষী দল
History of Christianity in India published by the United Theological Seminary, Bangolore, 1982, Volume 1.
সেন্ট জেভিয়ার ঃ্ব আলোকের অভিযাত্রী (মুক্তমনা)

''সর্বোপরি সাবধান হইতে হইবে, অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের সহিত আপোষ করিতে যাইও না। আমার এই কথা বলিবার উদ্দেশ্য ইহা নহে যে, কাহারও সহিত বিরোধ করিতে হইবে; কিন্তু সুখেই হউক, দুঃখেই হউক, নিজের ভাব সর্বদা ধরিয়া থাকিতে হইবে, দল বাড়াইবার উদ্দেশ্যে তোমার মতগুলি অপরের নানারূপ খেয়ালের অনুযায়ী করিতে যাইও না।'' - স্বামী বিবেকানন্দ

আয়ুধ

সোমা চন্দ

সূর্য্য উঠতে এখনো কিছু দেরি। তার আগের নিকষকালো অন্ধকারে ব্রাহ্মণীর বুক চিরে তীব্র গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে ডিঙিটা। বৈঠা বাইছে পালা করে চারজন। ভেতরে টিমটিম করে জ্বলছে একটা ছোট্ট লণ্ঠন। আর তার পাশে অচৈতন্য এক তরুণের মাথাটি কোলে নিয়ে বসে আছে দুই যুবক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে ডিঙির খোল। সবে একঘণ্টার পথ পেরিয়ে আসা। সদরঘাট এখনো অনেক দূর। ডিঙির ভেতর থেকে ক্ষীণ কণ্ঠস্ব শোনা গেল, মইদুল, জোরে টাইন দে, আইরো জোর টাইন্যা চল ভাই।

নৈঃশব্দ ভেদ করে মইদুলের ভেসে আসা আওয়াজ বলল, হ ছুটো কর্তা।

অরুন্ধতী পাশ ফিরে শুলেন। ভোর হতে এখনো অনেক দেরি। ভাবলেন উঠে এক গ্লাস জল খান। ইচ্ছে করল না। দুটো পর্যন্ত বইটা পড়ছিলেন, তারপর সামান্য তন্দ্রা। চোখ মেলে দেখেন ঘড়িতে তিনটে দশ। তারপর থেকেই এই এপাশ আর ওপাশ। আর্য্য বাড়িতে ফেরে নি।

বাবার হাত ধরে আরুই নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে পূবাকাশে সূর্যোদয় দেখছিল, রোজকার মতো। বাবা বলল, সূর্যকে প্রণাম কর আরুই। কৃতজ্ঞতা জানাও পরম শক্তিকে, তার উত্তাপ ছাড়া জীবন বরফ, তার আলোক না থাকলে আঁধারে হারায় মানব জনম।

সদরঘাট আরও আধ ঘণ্টার পথ। পথ বলতে নদীবক্ষ। নদীমাতৃক পূর্ববাংলার, জলপথই চলমান জনজীবনের গন্তব্যে পৌঁছাবার অন্যতম মাধ্যম, আপদেবিপদে একমাত্র ভরসা। সচ্ছল পরিবারগুলোর নিজস্ব ডিঙি বা ছোট নৌকা থাকে একাধিক। ডিঙির খোলে অসহায়, উদ্বিগ্ন দুই যুবক। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তারাও। শায়িত তরুণটির হাঁ মুখে একটু জল দিল একজন, অন্যজন পেট থেকে বেরিয়ে আসা নাড়িগুলিকে দু-হাতে প্রাণপণ চেপে রেখে চলেছ ফালা হয়ে যাওয়া গহ্বরে। অপরজন তার হাতে মায়ের আর একটি শাড়ি এগিয়ে দিয়ে বলল, আলো ফুটে গেছে। মইদুলের কণ্ঠস্বর শোনা গেল, এই তো, আইস্যা পড়সি ছুটো কর্তা।

বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ালেন অরুন্ধতী। সকালের প্রথম রোদ্দুর ছুঁয়েছে তার জারুল গাছের পাতা। একতলা বাড়িটার ছাদের পাশ বরাবর উঠে যাওয়া গাছটার নীচের দিককার ডালপালা ঝুলে নেমে এসেছে পাঁচিলের ওপর। আর্য্যকে কতবার বলেছেন লোক ডেকে একটু কাটিয়ে দিতে। সে বাবু শুনলে তো। তাছাড়া ছেলেবেলা থেকেই ছাদে বসে ঐ ডালপালার মাঝেই তার যত পড়াশোনা, ছবি আঁকা। এখনও স্কুল থেকে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে মুড়ির বাটি হাতে ছাদে উঠে যায়। ছাত্রছাত্রীরাও জানে স্যারকে কোথায় পাওয়া যাবে। মেহের বলে মেয়েটি বেশ একটু মিশুকে স্বভাবের। অন্যগুলোর মতো, ঠামি, বেশি করে মুড়িমাখা পাঠিও, বলে সোজা রওনা দেয় না সিঁড়ির দিকে। বরং জিজ্ঞাসা করে কিছু সাহায্য করবে কি না। অরুন্ধতী মনে মনে হাসেন।

ক'দিন ধরে বাবা কেমন যেন একটু গম্ভীর, একটু চিন্তান্বিত। আরুই এর মন খারাপ হয়ে যায়। সে ছায়ার মতো বাবার সঙ্গে লেগে থাকে সারাদিন।

দারোগাবাবুর শেষ বয়সের সন্তান সে। তার আরও দুটি ভাই-বোন আছে। চার-চারটে দাদার পরে সে একটি বোন। এছাড়া তো জেঠতুতো, খুড়তুতো, মাসতুতো, পিসতুতো, পাড়াতুতো সব মিলিয়ে আরও কতই না।

কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোর দিন সন্ধ্যাবেলায় সে জন্মাল যখন ততক্ষণে পুজোর সমস্ত আয়োজন শেষ। নানাবিধ উপাচারে সজ্জিত ঠাকুর দালানে মা লক্ষ্মীর চার হাত উঁচু মূর্তি। গোটা গাঁয়ে বিখ্যাত দারোগা বাড়ির লক্ষ্মীপূজা। তার বাবাকে পাঁচখানা গাঁয়ের মানুষ সাধু দারোগা বলে ডাকে।

দশদিন ধরে গ্রামের বৌ-ঝিরা, মা আর বৌদিদিদের সঙ্গে সঙ্গে নারকোল কুরিয়েছে, নাড়ু বানিয়েছে, তিল তক্তি, নাড়ু ছাঁদে ফেলা নারকোলের সন্দেশ, মোয়া, মুড়কি, খই এর উখরা আরো কত্ত কিছু।

জেঠিমা এসে ঘোষণা করল, পুজো বন্ধ। ছোট বৌ এর মেয়ে হয়েছে। অশৌচ। পুরোহিত মশাই শুধু পাঁচালি পড়ে দিয়ে চলে যাবেন।

বাঁধ ভাঙা উল্লাসে ফেটে পড়ল সব তুতো এবং নিজের দাদারা। একরকম লুঠ হতে লাগল নাড়ু, মোয়া, মুড়কির মটকাগুলো। গোটা গ্রাম জুড়ে রটে গেল দারোগা বাড়িতে মা লক্ষ্মী এসেছেন। তার বাবা দু-হাত কপালে জুড়ে

বলেছিলেন, বুকে কইরা তরে রাখুম মা রে।

সদর বাজার ঘাটে ডিঙি বেঁধে যখন ধরাধরি করে অচৈতন্য, লোহিত বর্ণ তরুণ মনোঋতকে নামানো হচ্ছে চারিপাশে লোকজন জড়ো হয়ে গেল। মইদুল কোনওক্রমে একটা সব্জির ভ্যান জোগাড় করে আনলে তাতে যখন পাঁচজনে মিলে মনোঋতকে তুলছে, সে একবার চোখ তুলে ঘোলাটে দৃষ্টিতে অস্ফুটে বলল, লথথখাআই...তারপর ধীরে ধীরে নিঃস্পন্দ হয়ে গেল।

আর্য্য'র নম্বরটা খাতা দেখে মোবাইল এ টাইপ করলেন অরুন্ধতী। একবার...দুবার...তিনবার...রিং হয়েই গেল। ফোন তুলল না।

তিনি সকালে উঠে বাড়ির চারপাশটায় একটু হাঁটাহাটি করেন। আগে পূব পাড়া ছাড়িয়ে কাজী ডাঙার মাঠ পর্যন্ত যেতেন। এখন আর অতটা পারেন না। হাঁপ ধরে। সত্তর পেরিয়েছেন চার বছর হল।

কলকাতার পাট চুকিয়ে চার বছরের আর্য্যকে নিয়ে উত্তর চব্বিশ পরগনার এই সীমান্ত পল্লীতে আজ থেকে কুড়ি বছর আগে তিনি এই ছোট্ট একতলা তিন কামরার বাড়িটি করে চলে এসেছিলেন। চাকুরি জীবনে স্বেচ্ছা অবসর নিলেন। সহকর্মীরা অনেক বুঝিয়েছিল। কিন্তু তিনি মনস্থির করে নিয়েছিলেন। এক সহকর্মী ও তার স্ত্রীর সহায়তায় সম্পূর্ণ অপরিচিত এই জায়গাটির খোঁজ পেয়েছিলেন তিনি। বাড়িটি তৈরির ক্ষেত্রেও তিনি অসামান্য সহায়তা পেয়েছিলেন তাদের। নয়ত কলকাতা থেকে এত দূরে এসে সব কিছু সামলানো তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

আর্য্যকে নিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তিনি কলকাতা ছাড়তে চেয়েছিলেন।

সকাল বেলা বাবা সদরে যাবে। তাড়াহুড়ো ব্যস্ততা। মাসে একবার বাবা রহমত চাচার নৌকায় শহরে যায়। সংসারের সারামাসের যাবতীয় সামগ্রী কিনে আনতে। বাবার সঙ্গে যায় তাদের বাড়িতেই থাকা মহেশ কাকার ছেলে প্রতাপদা।

মহেশ কাকা বাবার ডান হাত। বাবার সব কাজে সে থাকে। অসম্ভব শক্তি ও সাহসের অধিকারী সে। আগে বাবার সাথে মহেশ কাকা যেত। ইদানীং প্রতাপদা যায়। মহেশ কাকা এদিকের কাজকর্ম সামলায়।

কাকার বৌ মোতি কাকী মাকে সাহায্য করে। আরুই এর চার দাদা আর ছোট দুই ভাই-বোন সব্বাই মহেশ কাকার কোলে পিঠে চড়ে বড় হয়েছে। শুধু তাকে ছাড়া। সে বাবা আর মেজদাদা, মণিদার, ন্যাওটা।

বাবার সঙ্গে সে ভোরের বেলা নদীর পাড়ে ঘুরতে যায়। বাবার সঙ্গে নদীতে স্নান করে সূর্য মন্ত্র উচ্চারণ করে। বাড়ি ফিরে বাবা উচ্চস্বরে গীতা পাঠ করেন। বই লাগে না। সব শ্লোক বাবার জানা। শুনে শুনে তারও মুখস্থ হয়ে গেছে। বাবার সঙ্গে সঙ্গে সেও গলা মেলায়। বাবা থানায় যাওয়ার আগে তার থালা থেকে একসঙ্গে ভাত খায়। বিকেলে ফল বাগানে বাবার সঙ্গে সঙ্গে ঘোরে। কখনো একা হয়ে গাছেদের গায়ে হাত বুলিয়ে একটু কথাবার্তা, কুশল মঙ্গলও সেরে নেয়। সন্ধ্যাবেলা তাদের তুলসী মণ্ডপ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে অনেক সময় কীর্তনের রাশভারি আসর বসে। সেখানেও তার উপস্থিতি।

তার প্রবল রাশভারি বাবার কাছে আর কোনও ভাইবোন ঘেঁষতে সাহস পায় নি কখনো। এমনকি প্রতি শনিবার বার বাড়ির বাঁধানো উঠানে যখন শহরের সব গণ্যমান্য ব্যক্তিরা মিলে বাবার সাহিত্য, ধর্ম এবং সমসাময়িক ঘটনা বিষয়ক আলোচনা সভা বসে, সে সভাতেও বাবার কোলে তার জায়গা বরাদ্দ থাকে।

বাকি সময় মণিদা ইস্কুল থেকে ফিরলে আরুই তার হাত ধরে ঝুলে থাকে। দাদার সে আরুই নয়, লক্ষ্মীপুজোর দিন জন্মে দাদাদের অনেক নাড়ু মোয়া খাওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিল তাই...লখাই।

সব নিয়ম কানুন মিটিয়ে জেলা হালপাতাল থেকে দেহ নিয়ে ফিরতি পথে ডিঙি এসে ঘাটে লাগল যখন গোটা গাঁ ভেঙে পড়ল। দুই শোকস্তব্ধ বিদ্ধস্ত যুবক এবং এক হতবুদ্ধি তরুণ ডিঙি থেকে নেমে এল।

জনতার কাঁধে চেপে বাড়ির পথ ধরল। এ গ্রামের পথ ঘাটে ধূলি মেখে বড় হওয়া গাঁয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল, সাহসী, পরোপকারী, ব্যক্তিত্বে নেতৃত্বে সব্বাইকে মুগ্ধ করে রাখা তরুণটি, গত রাতে ডাকাতের আক্রমণে মাত্র একুশেই প্রাণ হারাতে হল যাকে।

কিন্তু চারিদিকে ফিসফাস...এ কেমন ডাকাতি...শুধু এই প্রাণটা কাড়তেই যেন কালো কাপড়ে মুখ ঢাকা দুষ্কৃতিরা হানা দিয়েছিল ঘোষাল বাড়িতে কাল রাতে। এমনিতেই চারদিকে চাপা উত্তেজনা...প্রতিদিনই গ্রাম ছাড়ছে কোন না কোন পরিবার...

মনু শুধু বলত, এ গ্রামে আমার বাপ-ঠাকুর্দার ভিটে, এ মাটি আমাগো, ক্যান যামু পরবাসে?

অরুন্ধতী খালি পায়ে হেঁটে এসে জারুল গাছটাকে ছুঁয়ে

দাঁড়ালেন। এ গাছটা তার সত্তার এক টুকরো। ওর শরীরে তিনি বুনে দিয়েছেন তার এক মুঠি জন্মভূমি।

তখনই হাতের মোবাইলটা বেজে উঠল। আর্য্য'র গলা। ঠামি, তুমি খেয়ে নিও। আমার ফিরতে রাত হবে। শান্ত গলায় অরুন্ধতী জিজ্ঞাসা করলেন, ও দিকের কি খবর?

কোন খবর নেই, বলে আর্য্য ফোনটা কেটে দিল। পাড়াটা থম থম করছে। কাজী ডাঙার কাছে আর্য্যরা পাঁচটি ছেলে মিলে একটি অবৈতনিক স্কুল করেছিল। এপাড়া ওপাড়া মিলিয়ে গোটা কুড়ি বাচ্চা জোগাড়ও হয়েছিল। বেশির ভাগটাই কাজী ডাঙার দিকের। আর্য্যটাই তো সব সময় নেতা। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এই ইস্কুলে শুধু বাংলা, অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোল পড়াশোনা হবে। মাতৃভাষা, মাতৃভূমির মাটির ইতিহাস আর ভূগোল। আর্য্যর মতে এটুকু ঠিক মত জানলেই একজন সম্পূর্ণ মানব অবয়ব নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। অঙ্ক, যতটুকু না জানলে নয়, ততটুকুই।

বেশ চলছিল স্কুলটা। আর্য্য এই গ্রামেই তার নিজের শৈশব এবং কৈশোর অতিবাহিত করা স্কুলটিতেই যখন গৈরিকের ঘাড়ে। সে ব্যবস্থাই চলছে। স্কুল থেকে যা মাইনে পায় তার সিংহভাগই যায় নিজের স্কুলের দাতব্যে। তারপর ঠামি আছে, ঘ্যান ঘ্যান করলেই হল।

কাল তার সেই স্কুল জ্বালিয়ে দিয়েছে কাজী ডাঙার বাসিন্দারা। আয়ুধ স্যার মানে আর্য্যরই এক বন্ধু পিয়াল এবং এক ছাত্রীর নিঁখোজ হওয়াকে কেন্দ্র করে।

বাবা বেরিয়ে গেলে আরুই মণিদার সঙ্গে ঘোষাল পুকুরে অনেকক্ষণ দাপাদাপি করল। সে সাঁতারটা শিখে গেছে এ কদিনে।

মণিদার তত্ত্বাবধানে এখন তার ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি চলছে। মা চেয়েছিল বাড়িতে শিক্ষক রেখে তার পড়াশোনা চলুক। কিন্তু আরুই জেদ ধরেছে, দাদাদের মতো সেও ইস্কুলেই যাবে। বাবার সঙ্গে মণিদার চুক্তি হয়েছে আরুইকে ইস্কুলে ভর্তি পরীক্ষার যোগ্যতায় উত্তীর্ণ করতে পারলে এক হাঁড়ি রসগোল্লা সে পাবে।

অতএব তার লেখাপড়ার ব্যাপারে মণিদার আগ্রহ কিছু কম নয়। সে বলল, অনেক হইসে লখাই, এইবার উঠ। আইজকা সতেরোর নামতা হওন চাই। আর বলতো দেখি, বালা রে, ইংরাজিতে কি কয়? কাইল তো শিখাইলাম তরে।

আরুই বলল, ব্যাংঙ্গেল। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে পড়ল, বাবাকে খুঁজতে খুঁজতে ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ দেখে দৌড়ানো অবস্থায় যখন আজ সকালে সজোরে ধাক্কা মেরে সোজা মেঝেতে পড়ল, সে দেখল মা তার দিকে না তাকিয়ে দৌড়ে গিয়ে আগে দরজায় খিল দিল।

আর তার পায়ের নীচে? বিস্মিত নয়নে সে দেখেছিল মেঝেতে ছড়ানো সোনার গয়নার রাশি। পাশে খোলা মুখ একটা বাক্স। বাবা তার কোটের উপর নীচের পকেটগুলোতে ছোট ছোট পুঁটুলির মতো কি সব ভরে নিচ্ছে। মা তার দিকে কড়া চোখে তাকিয়ে পিছন ফিরে চোখ বন্ধ করে বসে থাকতে বলেছিল।

আরুই মণিদার দিকে তাকিয়ে আস্তে করে জিজ্ঞাসা করল, বাবা কোথায় গেছে জানো মণিদা? কখন আসবে?

দু-বছর আগে স্বামী হারিয়েছিল মাধবীলতা। আজ তার একুশ বছরের ছেলে গেল। প্রথম পুত্রটি স্বামীর আগের পক্ষের। মাধবীলতার সঙ্গে তার বয়সের পার্থক্য সামান্যই। সে তার পরিবার নিয়ে ওদেশে।

এই পক্ষের তিনটি সাবালক ও দুটি নাবালক নাবালিক নিয়ে বুকে পাথর চেপে দিন কাটাচ্ছিলেন তিনি। মাঝের নাবালিকা কন্যাটি তখন কলকাতায়। মাসতুতো দিদির বাড়িতে থেকে লেখাপড়া শিখছে।

সর্বহারা দশা তখন তার। স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে তার যাবতীয় গয়নাগাঁটিও গেছে। আছে বলতে শুধু এই বাড়ি আর কিছু বাড়ি। তাও কতদিন...বুক কাঁপত। বিভিন্নভাবে প্রতিবেশী ভাইজানরা প্রচ্ছন্ন হুমকি দিচ্ছিল। মনু তার উপযুক্ত সন্তান। বাকি দুজনকে তিনি নাবালকই ভাবেন। দু-একবার মনুকে বলেওছিলেন, চল চইল্যাই যাই। মনুর এক গোঁ, পালামু ক্যান? এ মাটি আমার বাপ ঠাকুর্দার। এ ভিটাতে তারা দোল দুর্গোৎসব করসে। মরতে হয় এইখানেই মরুম। তবে মাইরা মরুম। মাধবীলতা কেঁদে বলেন, হ্যারা তোর বাপ রে ছাড়ে নাই। সাধু দারোগার বুকে ছোরা দেয়, এই সাহস। কেউ ভাবছিল কহনো? মনু বলে, অস্ত্র আছে, ভাইব্যেন না। আমার উপর ভরসা রাহেন।

ভরসা! ভরসা!! মাধবীলতা চিৎকার করতে গিয়ে অজ্ঞান হয়ে যান, কোথায় গেলি রে বাপ আমার? মনু, মনু রে...

আরুই কে কলকাতা থেকে নিয়ে আসা হয়েছে। সে বোবা হয়ে গেছে।

অস্ত্র...অস্ত্র...মোতি কাকী তাকে বলেছে সে রাতে মুখ ঢাকা ডাকাতরা বাড়ি ঢুকে প্রথমেই মণিদার খোঁজ করে। সোজা তার ঘরে ঢোকে। মণিদা কিছু বুঝে ওঠার আগেই কোপটা পড়ে হাতে। অসম লড়াই। আতঙ্কে চিৎকার করতেও ভুলে গেছে সবাই।

এক অসহায় বিধবা চোখের সামনে দেখছে তার সন্তানকে কোপাচ্ছে তারই স্বামীর পয়সায় খেয়ে পরে বেঁচে থাকা প্রবিবেশী। মুখ ঢাকা নাজিরের হাতে বাঁধা ধাগা তার চিনতে ভুল হয় নি। মাটিতে আছড়ে পরে তার অচৈতন্য দেহটা।

মোকি কাকী হাতের সামনে থাকা একটা দাও ছুঁড়ে দিয়েছিল আত্মরক্ষার জন্যে। মণিদা মৃদু হেসে তা ঠেলে সরিয়ে দেয়। ততক্ষণে তার চেরা পেট থেকে নাড়িভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে এসেছে।

মোকি কাকী হেঁচকি তুলতে তুলতে বলল, খোকাবাবা জাইনত গো অদের লইক্ষ্য ছিল শুধু সে। তাই প্রতিরোধের চেইষ্টাও করে নাই। আমাগো সকলরে বাঁচাইবার লাইগ্যা।

মইদুল এসে কেঁদে পড়ল তার পায়ের কাছে। দিদি গো পাইরলাম না, মণিকর্তা রে ফিরাইয়া আনতে...

আর্য্য ফিরতে পারবে না এখন। অরুন্ধতী আজ আর রান্নাঘরের দিকে গেলেন না। যা হোক কিছু খেয়ে দুপুর বেলাটা কাটিয়ে দেবেন। তার কিছু কাজ আছে।

আর্য্য'র স্কুলের তিনটি ছাত্রকে গেট খুলে বারান্দা পার হয়ে আসতে দেখলেন। তিনি জিজ্ঞেস করার আগেই শঙ্খ বলে ছেলেটা বলল, স্কুল বন্ধ করে দিয়েছি আমরা ঠামি। সমীর মিত্র আজ ভোরে হাসপাতালে মারা গেছে। বডি পোস্টমর্টেমে যাবে। পেটে দুটো গুলি। সঙ্গে স্যারের ইস্কুল জ্বালিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ। মেহেরের কোন খোঁজ নেই এখনও। পিয়ালদারও। স্যর, গৈরিক দাদাকে থানায় পাঠিয়েছে নিখোঁজ ডায়েরি করতে। ওদিকে কাজী ডাঙা ফুঁসছে। পিয়ালদাদের বাড়ি ভাঙচুর হয়েছে। ওরা বলছে মেয়েরকে পিয়ালদার বাড়ির লোকজন শেল্টার দিয়েছে। কিন্তু স্যারের সন্দেহ পিয়ালদা আদৌ বেঁচে আছে কিনা। পূব পাড়া, ও দিকে পশ্চিম পাড়ার ছেলেরা একজোট...কিন্তু পুলিশে ছয়লাপ। নেটওয়ার্ক বন্ধ। স্যর বলেছে, লাঠি সোঁটা রড সব তৈরি রাখতে। তুমি চিন্তা কোরোনা। রাতে কেউ একজন তোমার কাছে শুতে আসব।

অরুন্ধতী বললেন, তোরা একটু লধের উপর থেকে আমার একটা বাক্স নামিয়ে দিয়ে যাবি ভাই! দুপুরের মধ্যেই নৌকা ফিরে এল বাবাকে নিয়ে। আরুই বাগানে ঘুরছিল। দুপুরে সে ঘুমোয় না। এই সময়টা বাবা থানায়, মণিদা কলেজে। তাই বাগানের গাছগাছালি, পাতার আড়ালে থাকা পাখিদের কুশলমঙ্গল তত্ত্বতালাশ করার সময় এটা তার।

মইদুল দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, শিগগির কইরা আসো দিদি, দারোগা কর্তার হুঁশ নাই। প্রতাপ ভাই নৌকা বাইয়ে এনেছে। তার দুই হাত ফালা ফালা। রক্তে ভাসতাসে। আরুই নাট মন্দিরের সামনে পৌঁছে দেখল মহেশ কাকা বাবার গায়ের কোট খুলছে। ভিতরের কোটের গায়েও ছুরির ফালার চিহ্ন। বাবার সামনে কাছে লুটিয়ে পড়ে মা। গোটা বাড়ি জুড়ে হৈ হৈ। পিসিমা চেঁচাচ্ছে, সর্বনাশ হইল রে, ওরে নির্বহিংশ্যার ব্যাটা শরিফুল, বাইজ পড়ুক তর মাথায়, বাইজ...

আরুই দেখল তার প্রবল প্রতাপশালী বাবার যে চোখের দিকে তাকাতে ভয় পেত সবাই...পাড়া প্রতিবেশী...বাবার আশ্রিত কত আত্মীয়স্বজন, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে দুঃখ মানুষজন...তার সহোদর সদোদরারা...এমনকি তার মাও...সে চোখের দৃষ্টিতে কোনও সাড়া নেই। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে আছে কোন দিকে।

মণিদা ডাকছে বাবা, বাবা, শুনত্যাছেন? কোন সাড়া নেই। জেঠিমা আরুইকে বাবার কোলে ঠেলে দিল। বাবার চোখ থেকে শুধু এক ফোঁটা জল গড়িয়ে এল।

ঘোষাল দারোগার কাছে খবর ছিল তার বাড়ির গৃহদেবতার গহনার চোখ পড়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামীদের। পাঁচ পুরুষের অর্ঘ্য রাধামাধবের চরণে। গোপনে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের অনেক সাহায্য করেন। একবার স্ত্রীর অনুমতি নিয়ে তার মায়ের গহনাও দিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু গৃহদেবতার সম্পত্তি...তা রক্ষার দায়িত্ব...সঙ্গে তার স্ত্রীর যাবতীয় গহনাও নিয়ে সদরের ব্যাঙ্কে রাখতে যাচ্ছিলেন।

মইদুলের বাপ রহমতের নৌকাতেই তার যাওয়ার কথা। মাঝখান থেকে শরিফুল এসে বলল, আইসেন কর্তা। সদরে আমারও কিছু কাম আসে। আপনেরে লইয়া আমিই না হয় যাই।

এই রহমত, শরিফুল, বড় মিঞা এরা তিন পুরুষ ধরে তাদের নৌকা চালাচ্ছে, তাদেরই আশ্রিত, তাদেরই অন্নে প্রতিপালিত।

শরিফুল যখন মাঝ নদীতে স্বমূর্তি ধারণ করলে তিনি কোমরে গোঁজা রিভলবার বার করারও সময় পান নি। প্রতাপ তার বুকে বসানো ছুরি দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ছুরিতে ফালাফালা হয়ে যায় তার হাত। ততক্ষণে পাশে অপেক্ষমান ডিঙি থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে শরিফুলের লোকজন।

তারা যখন চলে গেল প্রতাপ কোন মতে বাঁধন খুলে কর্তাকে তুলে বসালেও কর্তার মুখ থেকে কোন সাড়া এলো না। ওই অবস্থায় রক্তাক্ত দুটি হাতে বৈঠা টেনে সে কর্তাকে বাড়ি আনে।

থানা থেকে লোকজন এল, উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্তারা এলেন। কাজের কাজ কিছুই হল না। শরিফুল কর্পূরের মতো উবে গেল।

ঘোষাল দারোগা এই বিশ্বাসঘাতকতার আঘাতটা নিতে পারলেন না। মানসিক ভারসাম্যহীন অবস্থায়, মাধবীলতার অক্লান্ত সেবা ও যত্নে মাস ছয়েক কাটিয়ে, অকূল সংসার, পরিজন, আশ্রিত সব ফেলে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

আরুই বোবা হয়ে গেল। চোখে জল নেই। মুখে ভাষা নেই। মণিদা...তার জীবন সুতোর এক প্রান্তে ছিল বাবা, অন্যপ্রান্ত মণিদা। সেই মণিদা...এ ভাবে?

অস্ত্র...অস্ত্র...

মোতি কাকী দুপুরে যখন চারিদিকে নিস্তব্ধ তাকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। চৌকির নীচ থেকে টেনে বার করলে একটা বাক্স। ডালা খুলে কাপড়ে জড়ানো কি বার করল। ভাঁজ খুলতেই আরুই দেখল একটা পিস্তল। বাবার।

কিন্তু সে তো শরিফুল চাচা লুঠ করেছিল। থানায় তাই জানানো হয়েছিল।

মোকি কাকী বলল না, সবাই তাই জানত। কিন্তু নদীর পাড় থেকে মইদুল কুড়িয়ে এনে মণিদাকে দেয়। সেই থেকে মণিদার কাছেই থাকত ওটা। রাতে বালিশের নীচে রাখত। মোতি কাকী টের পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই তিনজন ছাড়া আর কেউ জানত না এ খবর।

আরুই বলল, তবুও মণিদাকে এভাবে মরতে হল? মোতি কাকী বলল, হ্যায় কি আর মানুষ আছিল...দ্যাবতা...দ্যাবতা! প্রতিরোধ কি আর সে জনিনতনা? অমন ডাকাবুকো ছেলে। কিন্তু বুইঝতে পারছিল, প্রতিরোধ করলে সব যাইব না, না করলে হ্যায় একাই।

এইবার কাকী ক' গাছা চুল দিল তার হাতে, শিরশির করে উঠল তা শরীর। এ স্পর্শ তার জন্ম-জন্মান্তরের চেনা।

কাকী বলল, এইটুকুই বাঁচাইয়া রাখসি তুমার লাইগ্যা। শেষ উচ্চারণে সে 'লখাই ই' বইল্যা গ্যাছে।

সন্ধ্যাবেলা একবার আর্য্য এল। তার কিছু ওষুধ নিয়ে। থমথমে মুখ।

বিছানায় বসা আর্য্য'র মায়ায় তিনি হাত রাখলেন, এলোমেলো চুলগুলো। রেশমের মতো। ঠিক যেমনটি তার মণিদার ছিল।

জারুল গাছের নীচে পোঁতা আছে তার মণিদার মাথার চুল, আর তার জন্মভূমির বাগানের একমুঠো মাটি। মণিদার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে সেই যে তিনি কলকাতা থেকে বাড়ি গিয়েছিলেন তারপর ওলোট- পালোট হয়ে গেল সব কিছু।

রাতারাতি গ্রাম ছাড়তে হল তাদের। কপর্দকশূন্য অবস্থায়। কথা ছিল ও পারে মামার বাড়ির আশ্রয়ে যাবে সবাই। শেষ পর্যন্ত ঠাঁই হল শালবনি ক্যাম্পে। দুই দাদা সেখান থেকে ছিটকে গেল জীবনের পথে।

অরুন্ধতী ক্যাম্পের অস্থায়ী স্কুলে ভাইবোনকে নিয়ে যাতায়াত শুরু করল। হেড স্যার ফণীন্দ্রবাবু তার মেধা এবং পড়াশোনায় আগ্রহ দেখে অপত্য স্নেহ এগিয়ে এলেন।

বড়দাদা খবর পেয়ে এসে মা আর ভাই বোনকে তার কাছে নিয়ে গেলেন। অরুন্ধতী আই এ পাশ করল হোস্টেলে থেকে। টিউশনি করে আর স্কলারশিপ এর টাকায় সে তার পড়ার খরচ চালিয়ে মায়ের কাছেও কিছু টাকা পাঠাতে নিয়মিত।

ফনীন্দ্রবাবু ও তার স্ত্রীর উদ্যোগেই বি এ পাশ করার পরে সে একটি মফস্বল স্কুলে চাকরি পেল। ভাইবোন পাড়ার গাঁয়ে তার সঙ্গে এসে থাকতে রাজি হল না।

তারপর তার এই সরকারী চারকিটি পাওয়া। সেও একরকম ফনী জেঠু আর জেঠিমার পরামর্শে। মা তখন আর নেই। ভাই নিজের মতো ব্যবসা করছে। আর বোন একটি বেকার ছেলের সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করল। তবু ভালো সে নিজে তখন নার্সিং ট্রেনিং-এ।

এরপর বিয়ে। ফণী জেঠুরই উদ্যোগ। তারই এক কালের ছাত্র বিতান। ডাক্তার। বিয়ে হয়ে গেল। শাশুড়ি এবং স্বামী কারও পছন্দ নয় তার চাকরি করা। কিন্তু অরুন্ধতী সিদ্ধান্তে স্থির ছিলেন। চাকরি কোনও অবস্থাতেই ছাড়বেন না।

ইতিমধ্যে মা হলেন, বিহু'র। ঠাকুমা আর বাবার রাখা নাম। ভালো নাম বৈভবী। বিহু বড় হল শুধু বাবা আর ঠাকুমার আহ্লাদে। মা তার কেউ নয়। অবাধ প্রশ্রয়, অবাধ স্বাধীনতা। অরুন্ধতীর কোন মতের কেউ তোয়াক্কাও করল না।

কলকাতার নামী ইংরেজি মিডিয়াম স্কুল, দামী গাড়ি, নিত্যনতুন পোশাক পরিচ্ছদ, পকেট মানি, বন্ধুদের সঙ্গে রেগুলার পার্টি, আহ্লাদী পুতুলের মতো বাবার কোলে বসা, রাতে ঠাকুমার সঙ্গে ঘুমাতে যাওয়া...সে পোশাক পালটানোর মতো করে জীবনের পাতাগুলোও পালটাতে চাইছিল।

বিতানের সঙ্গে সম্পর্কের দূরত্বে তিনি অভ্যস্ত হয়েই গিয়েছিলেন। বিহুর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক তৈরিই হল না।

টেনথ স্ট্যান্ডার্ড এ বিহু ড্রিঙ্ক করে বেহুঁশ হয়ে বাড়ি ফিরল। ইলেভেন্থ এ তার ঠাকুমা মারা গেলেন। টোয়েলভেথ্

সে রেজেস্ট্রি করে বাবাকে ফোনে জানিয়ে মালয়েশিয়া হনিমুনে চলে গেল।

সে দিন রাতেই বিতানের সেরিব্রাল অ্যাটাক। সাত দিন যমে মানুষে লড়াই শেষে বিতান চলে গেল। বিহুকে জানানো হল। সে এসে পৌঁছালো বিতানের কাজের তিন দিন পরে।

অরুন্ধতী একা হাতে সব কিছু সামলে নিলেন। মইদুল এসেছিল। পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। এদেশে আসা এটা তার দ্বিতীয়বার। অরুন্ধতী যখন স্কুলে চাকরি পেয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন তখন প্রথমবার সে এসেছিল দারোগা তার মণিদার চেয়ে সামান্য ছোটই হবে। বলে গিয়েছিল, যখনই দরকার হবে ডেকো দিদি, এই মইদুল দারোগা কর্তার কিনা গুলাম। তিন পুরুষে তুমাদের নিমক খাইছে।

বিহু এল, আলমারি ঘাঁটাঘাঁটি করল। গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল। অরুন্ধতী আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে গেলেন।

মাস পাঁচেক পরে বিহু আবার এল এ বাড়িতে। অরুন্ধতী দেখেই বুঝলেন সে সন্তানসম্ভবা। অফিস থেকে ফেরার পর বিহু তার ঘরে নক করে এসে ঢুকলো। বলল, আমি একটা ঝামেলায় পড়েছি। কোনও দিনও কিছু তো চাইনি। আমাকে একটা ফেরার করবে?

অরুন্ধতী বললেন, কি সাহায্য চাও বলো। বিহু বলল, আমি ডিভোর্স নিচ্ছি। কিন্তু...ফাইভ মান্থস অলরেডি ওভার...ডঃ অ্যাবর্ট করতে রাজি না। আমি বুঝতে দেরি করেছি। ডেলিভারি ছাড়া আর কোনও ওয়ে নেই। তুমি কি এর দায়িত্ব নেবে? এ বাড়ি তুমি নিয়ে যাও। আমি ইউ এস এ তে সেটল করব।

অরুন্ধতী থ হয়েই বসে রইলেন।

যথাসময়ে আর্য্য জন্মাল, জ্ঞান এলে বিহু ফিরেও দেখল না। নার্সিং হোম থেকে ছুটি পেয়ে সে আপন গন্তব্যে ফিরে গেল। অরুন্ধতী তাকে কিছুদিনের বিশ্রামের জন্য বাড়িতে আসতে বলেছিলেন। বিহু নো থ্যাংস বলে চলে যায়।

অরুন্ধতী অফিস থেকে তিন মাসের ছুটি নিলেন। অ্যাকাউন্টসের মন্দিরা তার দেশ থেকে পরীকে আনিয়ে দিল। বড় হতে লাগল আর্য্য, তার আয়ুধ।

আর্য্য তখন তিন। সেই সময় এক সকালে প্রতিটি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা হল 'সিঙ্গাপুরে কার্যত অরুন্ধতী আর্য্যকে বুকে নিয়ে বাড়ি তালা বন্ধ করে কলকাতা ছেড়ে পালিয়ে গেলেন খড়্গপুরে ফণীজেঠুর বাড়ি।

তারপর সব কিছু একটু থিতিয়ে গেলে অত্যন্ত দ্রুততায় আজকের এই ঠিকানায় পৌঁছানো। সে সময়ে তিনি তার সহকর্মীদের কাছ থেকে যে সাহায্য পেয়েছিলেন তার জন্য আজীবন ঋণী থাকবেন।

পুরোনো জীবনের কোনও ছায়া তিনি আয়ূধ...তার একটুকরো সত্তা...একটুকরো মণিদা...আর্য্যর গায়েপড়তে দেন নি। আর্য্যর এই ঠামি ডাকটিও তার শেখানো নতুন করে । আর্য্যর দিকে তাকালে তার নিজেকে পূর্ণ, সার্থক মনে হয়। ঈশ্বর একটা আর্য্য তাকে নিয়ে তার জীবনের সব হারানোগুলো মিটিয়ে দিয়েছেন।

আর্য্যর মাথায় হাত রাখতেই সে ঠামির বুকে ভেঙে পড়ল।

তিনি জানেন কাল থেকে কি চলছে ছেলেটার ভেতর। স্বপ্নের স্কুলটাকে ওরা জ্বালিয়ে দিল।

পিয়াল আর্য্যর অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। মেয়েটা আর্য্যর ছাত্রী। মেহেরকে শুধু খুনই করেনি ওরা, তার আগে পৈশাচিক অত্যাচার চালিয়েছিল বাবা কাকা দাদা।

বিকেলে পাশের বাড়ির মেয়েটি এসে যখন বলল, দুই চোখে আগুন জ্বলে উঠেছিল অরুন্ধতীর। আর্য্য কান্না ভেজা গলায় বলল, পিয়ালের লাশ দত্তপুকুরে ভেসে উঠছে। অরুন্ধতী শক্ত হয়ে গেলেন।

আর্য্য বলল, আর কত সহ্য করব আমরা? তার দু'চোখে আগুন। অস্ত্র...অস্ত্র...এ বার অস্ত্র ধবর ঠামি।

আর্য্য বেরিয়ে যাচ্ছে। অরুন্ধতী পিছন থেকে ডেকে বললেন, তোর পড়ার টেবিলে একটা ব্যাগ রাখা আছে। নিয়ে যাস।

শিশির ভেজা পদ্ম

পিনাকি

১

উত্তর কলকাতার গলিতে ভোর হয় আচমকাই। সেই আলো ধীরেধীরে নিজের মতন পথ খুঁজে নিতে থাকে; বাড়ির উঠানে উঠে বসে, আবার জানালার ছিদ্রের ভিতর থেকে উঁকি মারতে থাকে। বিক্রমের ঘরে প্রতি ভোরে, এমনই খেলা খেলতে থাকে, আকাশ ফেরত আলো!

বিক্রম যেই খাটে শুয়েছ, মাথার সামনে একটা বড় জানালা আছে, এখান দিয়েই আলো এসে উঁকি মারছে। ভোর একসময় সকাল হয়। সকাল একসময় বেলা হয়! পৃথিবীতে সব ভোরই হয়ত এমনভাবেই শুরু হয়!

সকাল আটটার সময় ঘুম থেকে উঠেই বিক্রমের মনে হল, এরপরে যে গোটা দিন রয়েছে, সেই সময়টা তাকে কাটাতে হবে! এই ভাবনা তার কাছে অতটা বিস্ময়ের হতনা, যদি সংসারের একমাত্র অবলম্বন আচমকাই চলে না যেত! একবছর হয়ে গিয়েছে। বাবা মারা গেছেন। বোন মাধ্যমিক দিল। সে নিজেও গ্রাজুয়েশন করে তিনটে বছর ঘুরে বেরিয়েছে। প্রথম দুটো বছর বাবা ছিলেন। ছেলেটাকে সবসময় বলত—কিছু চেষ্টা করবার কথা। বিক্রম সেই কথা কানে নিত না। বন্ধুবান্ধব নিয়ে, গান-কবিতা-আড্ডা নিয়ে, বিকেলের আলোয় গঙ্গার বুকে ভেসে চলা স্টিমারের শব্দে যে পাখিদের সিলেবেল মিশে থাকে, সেই মুহূর্ত উপভোগ করতে করতে; দিনগুলো কেটে যেতো। রাত নামত ক্যারামের হুল্লোরে। সেইসব দিন খুব দ্রুত হারিয়ে গিয়েছে।

একদিন বিক্রম ঘরে এসে শুনল, কারখানায় বাবা আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়েছে। 'আর. জি. কর'-এ ভর্তি করা হয়েছে। বাবার হার্টে ফুটো ধরা পড়েছে। ঘরে নিয়ে আসা হল। অন্য সময় হলে, একজনের পরিবর্তে পরিবারের অন্য কেউ চাকরি পেতেই পারত; কিন্তু রিসেসনের সময় এখন, গোটা বিশ্বকে কর্মহীনতার চোরাবালি ক্রমশই তলিয়ে নিয়ে যাচ্ছে!

আসলে যাদের হাতে পুঁজি আছে, তারা উৎপাদন করছেন। এই উৎপাদন যদি বিক্রি করতে না পারেন, তাতে মুনাফা আসবে না। তাই কারখানার কেন্দ্রীয় কমিটি নতুন শ্রমনিয়োগে বিশ্বাসী নন, তবে ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দিয়েছে।

সেই জমানো টাকাই বাবার শেষ দিনগুলোতে, চিকিৎসা খরচের প্রধান সম্বল হয়ে উঠেছিল। বাবা বেঁচে ছিলেন মাত্র একবছর, তারপরের বছর বিক্রম বুঝতে পেরেছে, অভিভাবকহীনতা আসলে একটা সামাজিক রিসেসন! সংসারের প্রধান কর্মক্ষম মানুষটি যখন আচমকাই হারিয়ে যায়, পরিবর্তে নেমে আসে, আরেক অসহায়তা। পুরুষ প্রধান সমাজে পুরুষ অসহায় হয়ে ওঠে। বিক্রম অনেক চেষ্টা করছে অন্তত যেন একটা চাকরি পায়। এই বাজারে সংসার টানবার জন্য তাকে এমনটা করতেই হবে।

বিক্রম বিছানায় বসেই খেয়াল করলে টেবিলের মাঝখানে রাখা অ্যানরয়েড ফোনটায় ব্যাটারি মাত্র ২০%, মানে চার্জ দিতে হবে! খাট থেকে নেমে জানলার সামনে এসে দাঁড়ালো। উল্টোদিকে বাড়ি। মাঝখানে সরু পথ, লম্বা হয়ে সোজা চলে গিয়েছে। মিশেছে গলিতে। আজ রবিবার। আজ গলির মুখে মুখে আড্ডা বসবে। প্রতি রবিবারই পাড়াটা একইরকম থাকে, ইদানীং শুধু বিক্রম এইসব কিছু এড়িয়ে থাকছে। পকেটে টাকা নেই। মুদিন দোকানে ধারে মাল নেওয়া শুরু হয়েছে, একমাস হল।

বিক্রম ঠিক করল আজ বিকেলটা জেটিতে কাটাবে। বাবা চলে যাওয়ার পরে, আর চারপাশের হুল্লোড় ভালো লাগছে না, পরিবারের চিন্তা আচমকাই অদৃশ্য কুয়াশার মতন ঘিরে রেখেছে। সে নিজেও জানেনা, আদপে কোনদিন এই কুয়াশা কেটে সূর্যের আলো তার অন্ধকারকে ধুয়ে দিতে পারবে! আগে চেষ্টা করত, এখন তাও করা ছেড়ে দিয়েছে।

আগের রাতে সে একটা কবিতা লিখেছিল। দুটো লাইন সে দেখতে পেল, ওই সামনের গোল টেবিলের উপর ফোন দিয়ে চাপা দেওয়া। অনেক রাত অব্দি ভেবেছিল, তারপর শেষ রাতে খসে পড়া তারাদের মতন টুপ করে চার 'লাইন লেখা হয়ে গেল—' মৃত্যু ভালো তুমি / টগবগে একটা রক্ত বিন্দু / আচমকাই বেয়ে বেয়ে নামছে / আমার মায়ের কপাল থেকে...'

মায়ের কপালটা, সিঁথিটা একবছর দেখেনি বিক্রম! শুকনো নদী দেখতে কেউ চায়না। ওখানে তাকালেই, নিজের অসহায়তার সুযোগ পাওয়াটাও হয়ত সবার কপালে থাকে না।!

সিঁড়ি দিয়ে নেমে রান্নাঘরের সামনে এসে দেখল, মা কড়াইতে কিছু একটা ভাজছে। শেষ রবিবার কবে, পাঁঠার মাংস হয়েছে মনে নেই। তবে বাবা বেঁচে থাকতেও রবিবার গোল বাড়ির মাংস আনত। বাবা যখন পারত না, বিক্রম নিজেই গিয়ে আনত। এখন টাকার একটু টানাটানি চলছে, তাই মা হিসেব করে বাজার করতে পাঠায়।

—বনি কোথায়?

বিক্রমের কথা শুনে, বীণাপাণি বলল—ছাদে নেই তো?

—তুমি দেখনি!

—আমিতো এই শুনলাম। আরে এতক্ষণ আমার সঙ্গে রান্নাঘরেই ছিল। আমি জানিও না।

—তাহলে ছাদেই আছে। আমি মুখ ধুয়ে আসছি।

এইসব কথার মাঝেই সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছে, বছর ষোল বছরের কিশোরী। ফর্সা, পাতলা মুখটা ভীষণ মিষ্টি।

—এই দাদা, সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাবি?

—আজ!

—কেন? আজ আড্ডা দিতে যাবি নাকি?

—না, তা নয়। তবে কাজ আছে। তাছাড়া টিকিট পাওয়া যাবে?

—হ্যাঁরে।

—আজ না হয়ে অন্য দিন যাব?

বনির মুখ দেখে, মনে হল খুশি হয়নি। অনেক দিন বাদে মেয়েটা সরাসরি বায়না করলো। তাও বিক্রম ফিরিয়ে দিল! অসহায়তা অনেক সময় মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে পালটে ফেলে। এইসময় বিক্রম খরচ করতে চাইছিল না। তাই সে দ্রুত মুখ ধুতে চলে গেল।

দুপুরে শুয়ে-শুয়ে একটা উপন্যাস পড়ছিল। বাইরে তখন রোদ। ফোনটাকে দেখে নিল। ম্যাসেঞ্জারে নতুন ম্যাসেজ! বিক্রম নিজের ফেসবুক খুলে দেখল, আগের রাতে লেখা কবিতায় এরমধ্যেই সত্তরটা লাইক পড়েছে। এটা নতুন কিছু নয়, কেননা ফেসবুকের দেওয়ালে কিছু লিখবার সঙ্গে সঙ্গেই, মাত্র দশ মিটিরে মধ্যেই কমেন্ট আর লাইকের বন্যা বইতে থাকে। যারা বিক্রমের কবিতায় মুগ্ধ হয়েছে, তাঁদের ভিতর অনেকেই লিটিল ম্যাগাজিনের সম্পাদক। তাঁরাই ম্যাসেজ পাঠান। আজ তেমন কিছু আসতেই পারে। বিক্রম বইটা বিছানার একপাশে রেখে, ফোনটায় ম্যাসেঞ্জারটা দেখে নিল। যেটা দেখল, নিজের চোখকে সে বিশ্বাস করতে পারল না!

একমাস আগে ফেস বুক ঘেঁটে বীথি মেয়েটাকে 'ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট' পাঠিয়েছিল। দীর্ঘ একমাস বাদে, আজ তারা বন্ধু হয়েছে। শুধু তাই নয়, মেয়েটা বাংলা টাইপে 'শুভেচ্ছা' লিখে পাঠিয়েছে। ফেস বুকে শুধু মেয়েদের শরীর দেখে, বন্ধুত্ব বার্তা যেই সব ছেলেরা পাঠায়; বিক্রম তাদের মধ্যে পড়ে না। যে কোন মেয়ের চোখ ওকে টানে। বলতে গেলে কবিতার প্রথম লাইন লিখতে বসে প্রতি মুহূর্তে বিক্রম—অচেনা বা চেনা নারীর চোখ চিন্তা করে। এমনটা না ভাবলে, সে লিখতে পারবে না। তাই আজ অব্দি যত কবিতা লিখে উঠছে পেরেছে, তাতে পরোক্ষভাবে নারীর অবদান রয়ে গেল। বীথির ঘন চুল মাথায়, শ্রাবণের গভীর মেঘ। ভ্রু-দুটো চকিত বিদ্যুৎ মুখর হয়ে ওঠে। চোখ দুটো দেখলেই মনে হয় বুকের ভিতর কে যেন খানিক চিঁড়ে দিয়ে গেল! এই যে আরোপিত সমাজ, পণ্যমুখী মানব অনুভূতি, এইসব কিছু থেকে বিক্রম সৃষ্টির উপাদান পায় না। বীথিকে দেখে ওর মনে হয়েছিল, এমন চোখের জল একটা গোটা 'মেঘদূত' রচনা করা যায়। সত্যি বলতে সেই দিনের পর থেকেই বীথি, অনেকটা জায়গা দখল করে নিয়েছিল। মানুষ অনেক সময় নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী চলতে পারে না। তেমনভাবে এতদিন শুধুই ছবিতে চোখ দেখেছে আর প্রোফাইলের সমস্ত ছবি দেখতে পারেনি। কেননা বীথির বন্ধু ছাড়া আর কেউ, প্রোফাইলের ছবি দেখতে পেত না। সেই যে বীথির প্রোফাইলে লেখা বাংলায় স্ট্যাটাস—'অচেনা অতিথি, তুমি কি আমার বন্ধু? এসো হাত ধরি...'—এমন স্ট্যাটাস সেই রাতেই বিক্রমকে ভাবালো। বিক্রম দু'লাইন লিখল—ভালোবাসা অনেকটা নীল হাতছানি / আলো-আঁধারি খেলা করে / অচেনা আমি তবু চেনা / এসো হাতে হাত রেখে বাড়ি ফিরি!' এই লেখাটা সেইরাতে আশ্চর্যভাবে দু'শো লাইক পেয়েছিল! বুঝে গেল, বীথিই তার প্রেরণা।

আজ যখন দেখল, বীথি বন্ধুত্বের বার্তা গ্রহণ হয়েছে, বিক্রমের মনে হচ্ছে যেই সব কবিতার জন্ম হতে গিয়েও হল না, সেইসব থেমে যাওয়া অনুভূতি আজ পূর্ণতা পাবে।

ঘড়িতে এখন তিনটে। অ্যানরয়েড ফোনে, বিক্রম ফেসবুকে বীথির প্রোফাইল দেখল। মেয়েটা খুব সুন্দর। ফর্সা গালে টোল পড়েছে। মাথার চুল কুচকুচে কালো। খুব মোটা চেহারা নয়, আবার রোগাও নয়। দুটো চোখ দেখেই, আটকে গেল! যেন বহুযুগ ধরে বিক্রম এমনই মোহে আবিষ্ট হতে চেয়েছিল। এমন একটা ছবি দেখতে দেখতে পিছনে অলকানন্দা নদী, সামনে দাঁড়িয়ে বীথি,—এই ছবি দেখেই টাইপ করে পাঠিয়ে দিল।

—আমি বিক্রম। আপনি কোথায় থাকেন?

নিঃশ্বাস থামিয়ে বিক্রম অপেক্ষা করবে উত্তরের। আজ সারাদিন সে নিজেকে গৃহবন্দী করে রাখবে।

২

সকালবেলা বাজারে যাওয়ার সময়, বীণাপাণি কিছুটা ঘাবড়িয়ে গেল। কেননা মাস খরচের টাকা কমতে শুরু করেছে। মাসের এখনো কুড়ি দিন আছে। মুদির দোকানে ধারের খাতা লম্বা হচ্ছে। বাজার যেতে হলে মুদিন দোকানের সামনে দিয়েই যেতে হবে। তখন যদি মাধববাবু দেখে ফেলেন, নির্ঘাত ধারের কথাটি তুলবেন।

সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে, হাতে বাজারের থলে নিয়ে এই কথাগুলোই ভাবছিল। অবশ্য এর হাত থেকে বাঁচতে হলে বিক্রমকে বাজারে পাঠাতে হবে। এমন ভেবেই বীণাপাণি, থলেটা ধরিয়ে দিল।

রাস্তায় নেমে বিক্রম ভাবছে, আগের দিনের সকাল শুরু হয়েছিল বেশ ভালোভাবে। বীথির বন্ধুত্বের মুহূর্তটুকু তার কাছে দামি হয়ে রয়েছে। সেই দুপুর, গোটা দুপুর, আর জানালায় চোখ রেখে দেখা আকাশ, পাখি, বিকেল, বাচ্চাদের কোলাহল—এতসব নিয়ে সে রাতে ভেবেছে। আর অনেক রাত অব্দি অপেক্ষা করেছিল। তার পাঠানো মেসেজে যদি মেয়েটা রিপ্লাই দেয়! ঘড়িতে রাত দু'টো বেজে ছিল। তখনও কোনো রিপ্লাই নেই। এখন বেলা দশটা। সে ফোনে নেট সংযুক্ত করল। দেখল ম্যাসেঞ্জারের জায়গাটা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। হ্যাঁ বীথি!

শেষ অব্দি উত্তর দিল।

—বেলঘরিয়া। আপনি কোথায় থাকেন?

বিক্রম দেখল, বীথি অনলাইন। সে উত্তর দিল।

—হালসি বাগান।

—কী করেন?

—আমি আপাতত ছাত্র।

—আপনি কবিতা লেখেন?

এইবার বিক্রম মনে মনে বলল—মানে আমার লেখা নিশ্চয় মেয়েটা পড়েছে! অদ্ভুত মেয়ে, লাইক করেনি আর কমেন্ট করেনি। তাও আমি যে কবিতা লিখি সেইটুকু ওর চোখে ধরা পড়েছে আমার কাছে এটাই অনেক বড় ব্যাপার।

বিক্রম বলল—আপনি আমার কবিতা পড়েছেন।

মেয়েটি উত্তর দিল—না হলে বললাম কেন?

বিক্রম বাজারে থলি নিয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছ। রাস্তায় দু'চারটে চেনা মুখ দেখতে পেয়েই, যেই মুখটা দিয়ে বাজারে যাওয়া যায়, না গিয়ে উল্টোদিকের পথ ধরল। ঘড়িতে বেলা এগারোটা বেজেছে। এখন মোটামুটি সবজির দাম কমতে শুরু করে। রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে উত্তর দিল বীথি—তুমি কিছু করনা?

—কী করব?

টাইপ করে পাঠিয়ে দিল বিক্রম।

—কাজ।

বিক্রম ভাবল দীর্ঘ একমাস বাদে সে পেয়েছে বীথিকে, এইবার যদি মেয়েটা শোনে—বিক্রম কাঠ বেকার। কথাই বলতে চাইবে না। সে দেখেছে এমন মেয়েরা ঘরে বসে থাকা ছেলেদের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখতে চায় না। তারা ঘরে বসে থাকা ছেলেদের অপদার্থ বলে মনে করে। বীথিও তাই ভাববে। কেননা কাজ নেই আর কাজ খুঁজছিল ভিতর তফাৎ থাকলেও, খুব একটা ফারাক নেই।

বিক্রম লিখল---কাজ বলতে পারিবারিক ব্যবসা আছে।—কাপড়ের।

—তুমি মন দিয়ে করছ তো?

—আমিই তো দেখি। তুমি...

দেখল বীথি অফলাইন হয়ে গিয়েছে।

বাজারে গিয়ে দু'আটি কলমি শাক আর কুমড়ো কিনল। আসবার সময় পাঁচশ ডাল আনতে হবে। বিক্রম মনে মনে বলল মেয়েটা খুব ভালো।

মুদির দোকানের সামনে এসে বিক্রম বলল—মাধবকাকু পাঁচশ ডাল দিন।

মাধব ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল—কত ধার আছে?

—দেখুন একটু।

—প্রায় দেড় হাজার। শেষ তিনমাসে একটাকাও ছোঁয়াওনি।

বিক্রম মাথায় হাত দিল, চুলকে নিয়ে বলল,

—জ্যেঠু এত হয়ে গিয়েছে!

—বাবা, যদি এইভাবে মাল কিনে ধারে চলে যাও, তবে এই যে আমার খাতা। এর পিছনে যত পাতা আছে সব ভরে যাবে। মা'কে বলও এইবার কিছু কিছু করে শোধ দিতে।

—আমি বলব। আমারই দোষ, মা আগের দিন বলেছিলেন, হিসেবটা নিতে। আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

কথা কটা বলে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বিক্রম মুখে নিপুণ অভিনেতার মতন, কিছু একটা ভুলে যাওয়ার ভান করল,

বলল—জ্যেঠু কিছু একটার জন্য এসেছিলাম। কী বলুনতো?

মাধব দেখল দিনেরবেলা কথা না বাড়িয়ে, কাটিয়ে দিতে হবে। কেননা খরিদ্দারের ভিড় বাড়ছে আর বিক্রমের কাছ থেকে কিছু পাওয়া যাবে না। সরাসরি দেবে না বলা যায় না, কেননা বিক্রমদের একটা সম্মান আছে। —বিক্রমের বাবাকে, মাধব শ্রদ্ধা করত। বছর পঞ্চাশের সাদা-পাকা চুলের মাধব বলল—কিছু নিতে এসেছ। এমনি এমনি আসনি। বলবার থাকলে বলও।

—পাঁচশ মুসুরির ডাল

বিক্রমের মুখের দিকে তাকালো, বলল—এইবার নিয়ে কত হল মনে রেখো...

বাড়ি ফিরবার সময় বিক্রমের মনে হচ্ছিল, মাকে গিয়ে টাকার কথাটা বলতে হবে। এই বলবার সময়, সে কোন ছলনার আশ্রয় নেবে না। কেননা, মা নিজেও জানেন, মুদির দোকানের বাকির খাতা ক্রমশ বাড়ছে। বিক্রম চুপ থেকে ছলনার আশ্রয় নেবে, কেননা এই মুহূর্তে বিক্রমের উচিত ছিল টাকার দায়িত্ব নেওয়ার। নিজের অসহায়তা মায়ের চোখে পাচ্ছে দেখে ফেলে, তাই চুপ থাকবে। বলবেও না। আপাতত একমাস সময় নিয়ে, বিক্রম দেখবে, যদি রোজগারের ব্যবস্থা হয়। তারপর না হয় অন্যকিছু ভাবা যাবে।

বাড়িতে যখন ফিরল, ঘড়িতে বেলা দুটো। মায়ের রান্না মোটামুটিভাবে শেষ। তাও কলমি শাক আনতে বলেছিল, আজ রান্না হবে শাক-ভাত, মুসুরির ডাল; রাতে ফেনা ভাত। রান্নাঘরে কাজ করতে করতে বীণাপাণি বলল-ডাল আগেই ছিলরে। খুব অল্প। কাল সকাল-সকাল মেয়েটা যাবে। তাই আগে থাকতে আনিয়ে রাখলাম।

বিক্রম রান্না ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে। কিছুটা অবাক হয়ে গিয়েছে!

—বনি, আবার কাল কোথায় যাবে!

—স্কুল থেকে সেই যে ঘুরতে গিয়ে যাবে বলে, চারহাজার টাকা চাইলো। ঘাটশিলা, ভুলে গেলি?

—কিন্তু মা, সেটাতো দিতে পারলাম না।

—কাল বারুইপুরে এক বান্ধবীর বাড়ি যাবে। সারাদিন থাকবে। কোচিনের বন্ধু।

বিক্রম মনে করবার চেষ্টা করল। মনে পড়ল, মাসের প্রথমেই স্কুলে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য, চার হাজার টাকার ধাক্কা সামলানো সম্ভব ছিল ন। এই টাকাটাই আসলে এই মাসের বিপর্যয়ের কারণ।

গোটা মাস গেলে, জমানো টাকার সুদ পায়, মাত্র তিন হাজার আটশ টাকা। চার হাজার এখন অনেক টাকা। বাবা বেঁচে থাকতে ভাবতেই হত না। তাই এখন বোনকে ভুলতে হয়, বারুইপুরে গিয়ে! তবুও ভালো মেয়েটা কিছুদিনের জন্য হলেও আনন্দে থাকবে। শেষ একবছর হাসতেই ভুলে গিয়েছে!

বিক্রম বলল—মনে পড়েছে। মা আমি উপরে আছি। স্নান করেই নামব।

বীণাপাণি শাক ধুতে ধুতে বলল—বাবু, বেশি দেরি করিস না। আজ আবার আমায় সন্ধ্যা মাসির বাড়ি যেতে হবে। দেখি সেলাইয়ের কাজ যদি পাই।

—তোমার চোখের এই অবস্থা সেলাইয়ের কাজ না নিলেই নয়?

—কেন রে? মাসের শেষে টাকা আসবে তো...

—তোমার চোখে এমনিতেই বেয়ে বেয়ে জল পড়ে। অত চাপ পড়লে চোখ নষ্ট হয়ে যাবে।

—সে এমনিতেও যাবে ওমনিতেও।

—তোমার মাইনাস পাওয়ার। তাও তো দু'বছর হল ডাক্তার দেখাও নি।

—বাদ দে। এখন দেখালেই খরচ। বনি জিওগ্রাফি নিয়ে পাশ দিক। তারপর না হয়...

—আমি বুঝি না, স্কুলের খরচ আছে। সংসার খরচ আছে। আমিও তো ঘরে বসে নেই।

—জানি বাবা। সারাটা দিন এমনভাবে ঘুরছিস। চাকরি চাকরি...করে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—তাও পাচ্ছি কোথায়! কেউ নতুনদের সুযোগ দিতে চাইছে না।

—তাইতো বলছি যতদিন তোর একটা চাকরি না হচ্ছে, আমায় কাজটা করতেই হবে।

বিক্রম জানে, মাকে বলে লাভ নেই। প্রতিবাদ না করে সিঁড়ি দিয়ে উপরে চলে গেল।

রাতে পড়বার টেবিলে, পাতার উপর দুটো বাক্য লিখল। গোটা ঘর অন্ধকারে ভরা। একঘর অন্ধকারে, ভিতরের একপাশে টেবিল ল্যাম্প জ্বলছে। টেবিলে খাতার দু'পাশে হাত রেখে, মাথা মুড়ে, কাঠের চেয়ারে বসে আছে বিক্রম। ঘর, ঘরের ভিতর অন্ধকার, আর অন্ধকারের মাঝে জ্বলতে থাকা টেবিলে ল্যাম্পের আলো—দেখে মনে হয়, জন বিচ্ছিন্ন এক দ্বীপে, তাঁবুর ভিতরে খানিক আলোর আভাস! পাশের জানলা খোলা। সেখান দিয়ে, উল্টোদিকের বাড়ির ছাদ দেখা যাচ্ছে। কেউ একজন তারে কাপড় তুলতে এসেছে।

সেই ছায়ায়, বিক্রম দেখল এক যুবতী ভীরু পায়ে তারে

ঝুলন্ত অন্তর্বাস হাতে তুলে নিল। এই মেয়েটির মুখ দেখা যাচ্ছে না। তার লজ্জা অনুধাবন করতে পাচ্ছে।

মেসেঞ্জার বেজে উঠল। টুং টুং আওয়াজ। বিক্রম দেখল, অনেকেই বার্তা পাঠিয়েছে, বীথি তাতে নেই। মেয়েটা নিজে থেকে কথা বলতে চায় না। বিক্রমের কিছুটা অভিমান হল। একজন এতটা নিষ্প্রভ! একজন কবির অনুভূতিকে গুরুত্ব দেয় না। এই পৃথিবীতে মানুষ প্রতিনিয়ত, নিজেকে নিয়ে বেঁচে রয়েছে। এমনটাই ঠিক মেয়েটির নিজের কাজ থাকতেই পারে, এমনটাও ঠিক বিক্রমতো আর অনুপম রায় নয়, যেচে গুণমুগ্ধরা কথা বলবে! তাও কি এতটুকু গুরুত্বও আশা করতে পারে না! খুব রাগ হল। দারুণ রাগ হল। মনে হচ্ছে জানলা দিয়ে বাইরে যে আকাশটা ফালির মতন শুয়ে আছে, দেখা যাচ্ছে, কালো-নীলে মিশে যাওয়া অন্ধকার আকাশ, তাকে জাগিয়ে দেবে, বলবে—কেমনভাবে তুমিও এতো চুপটি মেরে বসে আছো? আমার যন্ত্রণা তুমি কী বুঝতে চাইছ না! বুঝবে না! খুব কষ্ট! বীথিকে বলে দিও, আমি ভালোও নেই। ওকে ভালোবাসলেই আমি ভালো থাকব।

৩

দেখো, তোমার বাবা আমাকে দাদা বলতেন। তাই তোমায় আসতে বলেছিলাম। কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ, চারপাশে কেমনভাবে ব্যবসা মার খাচ্ছে। আমার এইরকম তিনটে চায়ের দোকান আছে। ভেবেছিলাম হিসেব রাখবার জন্য তোমাকে রাখব। কিন্তু ব্যবসার অবস্থা খারাপ।

অন্তু মাল, কথাগুলো বলেই মাকে নস্যি টানল। বিক্রম শেষ তিন সপ্তাহ ধরে, খুব চেষ্টা করে চলেছে। অনেক জায়গায় ঘুরলো। অনেকের সামনে দাঁড়ালো, তাও ভাগ্যে শিকে ছিঁড়ল না।

মায়ের কথায় অন্তু মালের বাড়িতে দেখা করতে এসেছে। বউ বাজারের আঁকাবাঁকা গলি পেরিয়ে, তিনতলা বাড়ির একতলার ঘরে, বছর ষাটের এক মোটা ভদ্রলোক নরম গদিতে শুয়ে আছেন, পাতলা পাঞ্জাবি হাওয়ায় উড়ছে, সিলিং ফ্যান ঘুরছে। লোকটির সামনে দাঁড়িয়ে আছে বিক্রম। মায়ের কাছে ঠিকানা পেয়ে, কাজের জন্য এসেছে। বাবা বেঁচে থাকতে লোকটি একদিন, বাড়িতে এসেছিল। ফোন নম্বর দিয়ে বলেছিল দেখা করবার জন্য।

ভদ্রলোক নিজেও বুঝতে পারেন নি, তার দেওয়া নম্বরটা বিক্রমরা যত্ন করে রেখে দেবে। বীণাপাণি প্রথমে ফোন করে ছেলের কথা বলে। বিক্রম দেখা করতে এসেছে। এখন ঘড়িতে বাজে বারোটা দশ। বিক্রম বুঝতে পারছে, লোকটি কাজ দিতে পারবে না।

বিক্রম বলল—ঠিক আছে পড়ে যদি কোন কাজে দরকার লাগে ডাকবেন।

লোকটি বলল—আচ্ছা, দেখবোখন।

রাস্তায় নেমে লোকটিকে স্রেফ অসভ্য বলে মনে হল। বাবার সঙ্গে লোকটির সম্পর্ক ভালোই ছিল। বিক্রমের মনে আছে, বাবার অসুস্থ হাত ধরে বলেছিল দেখবে, আজ মনে হচ্ছে সেইসব মিথ্যা কথা বলেছিল। লোকটা বলবার জন্য বলেছিল। কেননা প্রথম দর্শনে এমন চোখ দিয়ে তাকালেন, যে রবিবারের সকালে বিক্রম জ্বালাতে এসেছে! এতক্ষণ দাঁড়িয়ে, জল অব্দি সাধল না! পৃথিবীটা বিচিত্র মানুষে ভরা। বিক্রমের এক ফোঁটাও খারাপ লাগল না। মনে খুব ব্যথা পেয়েছে। বাবার অভাব বোধ করল। অন্তু মালের প্রতি তেমন একটা শ্রদ্ধার ভাব শুরুতেই ছিল না, কেননা মানুষের মুখই তার ভিতরের কথা বলে।

এত ঘুরেও সে একটা চাকরি জোটাতে পারেনি। আজ এই মুহূর্তে এই বোধটুকু বিক্রমকে গিলে খাচ্ছিল। বীণাপাণির চোখের অবস্থা খুব খারাপ হতে শুরু করেছে। কয়েকদিন বাদে হয়তবা দৃষ্টিশক্তি হারাবে! ডাক্তার অন্তত তাই বলেছে।

বিক্রম হাঁটছে, যেমনভাবে ঠাণ্ডা রক্তের প্রাণী বুকে ভর দিয়ে হেঁটে চলে, তেমন ভাবেই হাঁটছে। হাতে সময় অফুরন্ত। চারপাশের কোলাহল মুখর রবিবারের দুপুর, অচেনা মানুষের আড্ডা, সরু রাস্তা জুড়ে ক্রিকেটের শোরগোল—এইসব কিছু নিয়ে, বিক্রম এগিয়ে চলেছে। একসময় এই রবিবারগুলো ছিল তার কাছে বড্ড নিজের; আজ বোঝা, কেননা সকালে উঠে তাকে দেখাতে হবে সে ব্যস্ত! মানুষের কাজহীন জীবন যখন অন্য সকলের কাছে খোরাপ হয়ে ওঠে, তখন সেই মানুষ চায়, নিজেকে অন্যের চোখে নিজের অস্তিত্বের প্রমাণ রাখতে। সে অন্যের মতন নিজেকে পালটাতে না পারলে, নিজের চারপাশের অবস্থা পালটে ফেলতে চায়। বিক্রমের অনেক বেশি সময় ধরে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে রাখতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সে ভাবল, আজ একটু গঙ্গার ধারে যাবে।

সন্ধ্যা নেমেছে, আকাশ বেয়ে গঙ্গার বুকে মিশবে। জেটির এক ধারে দাঁড়িয়ে দেখছিল, স্টিমার যাত্রীদের নিয়ে আসছে। আজ রবিবার তাই অন্যদিনের মতন ভিড় নেই। হাওয়া এসে মুখে ঝাঁপটা মেরে গেল। বিক্রমের জামার কলার উড়ছিল। বিক্রম ভাবছে—এই যে শান্ত গঙ্গা, পরিণত রাতমুখি সন্ধ্যা সংশয়, এই যে আড্ডায় বিহ্বল মানুষেরা—তারা হয়ত খোঁজ

নেবেনা, যদি একটা প্রাণ এখনোই হারিয়ে যায়! প্রাণ, এই পৃথিবীতে এখন খুব সস্তা হয়ে গিয়েছে। বিক্রম স্থির জলের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তারপর আচমকাই ঠিক করে ফেলল...

বিক্রমের কাছে এই জীবন অসহ্য হয়ে উঠেছে। সে মৃত্যুর আগে, একটা কথা বলে যাবে। একটা বাক্য লিখে যাবে। ফেসবুকের দেওয়ালে সে লিখল, নিজের সকল বন্ধুদের জন্য—

'চললাম, আর হয়ত দেখা হবে না। আমার এই যাত্রার দায়িত্ব আমারই।'

দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, একশটা লাফক, মাত্র কয়েক মিনিটে! আর, লেখার নীচে মন্তব্য। নানারকমের মন্তব্য—

—কিরে কোথায় যাবি!

—হ্যাঁ, আয় ঘুরে।

—আসছে বছর আবার হবে।

—যেও না বিক্রমদা।

সবক'টা বক্তব্য পড়ে বিক্রম মনে মনে বলল—মানুষ এখন বিনোদন চায়, চব্বিশ ঘণ্টা। তার কাছে মৃত্যু আসলে বিনোদন!

ঠিক এইসময়ে একটা ব্যক্তিগত বার্তা ঢুকল ম্যাসেঞ্জার!

বিক্রম দ্রুত শেষবারের মতন দেখে নিল, বীথি!!

'নিজেকে শেষ করে দেওয়াটা কাপুরুষের কাজ। ভিতুরাই তা করে। তুমি একজন ভণ্ড কবি। তোমার কবিতা মন ছুঁলেও, তাতে সত্য নেই...।'

বিক্রম দু'মিনিটের জন্য ভাবল—মেয়েটা আমার কবিতা পড়ে! আমার লেখা দেখে। উত্তর দিল, মানে, আমি ওর স্মৃতি থেকে মুছে যাইনি!

—আমার আর বাঁচতে ইচ্ছা করছে না। বীথি।

—কেন?

—অনেক কথা আছে। আমার পরিচয় তুমি পাওনি।

—কবি। এটাই সবচেয়ে বড় পরিচয়।

—আমি...বেঁচে কী করব?

আজকের দিনটা বেঁচে থাকো। আগামি কালের অপেক্ষা কর। আমরা কেউ জানিনা নতুন দিন আমাদের জন্য নতুন কিছু আনবে কি না! আমি শুধু বিশ্বাস করি, দুটি দিন হুবহু এক এক রকমের হতে পারে না। তোমার দেখা দরকার। তাই নয় কি? আর যদি আমায় বন্ধু বলে মনে করো, তাহলে পালিয়ে যেও না। অন্তত আমার জন্য। আর বলব না...

বীথি অফলাইন হয়ে গিয়েছে। বিক্রম মনে মনে বলল—সেই কখন বেরিয়েছি। মা চিন্তা করবে।

কিছুক্ষণের জন্য জেটির লোহার স্তম্ভের উপর বসে পড়ল। ঘড়িতে রাত আটটা। এর মধ্যেই অনেক রাত হয়ে গিয়েছে! আকাশের দিকে তাকিয়ে বিক্রমের মনে হচ্ছে নিচে যে বহমান নদী আসলে তা আকাশের প্রতিবিম্ব; সেই জলে বহু ছবি ভেসে ওঠে, বাবার হাত ধরে আসা, বোনের সঙ্গে বিসর্জন দেখা, মায়ের কোমর জড়িয়ে সিন্দুর উৎসবে মেতে থাকা—সব কিছুতেই ছোটবেলার ছাপ। কিছুক্ষণ আগে এইসব কিছু ছেড়ে মুহূর্তেই হারিয়ে যেতে চেয়েছিল। বিক্রমের মনে হচ্ছে, সে স্বার্থপরের মতন কি পালিয়ে যেতে চেয়েছিল? বীথি মেয়েটাকে খুব দেখতে ইচ্ছা করছে। তাকে ম্যাসেঞ্জার বলবে—দেখা করবার জন্য। আবার ভাবল এত আবেগ ঠিক নয়। বীথি খারাপ ভালো! তারা দূরে থাকুক, কিন্তু বন্ধু হয়েই থাকুক। এইবার উঠতে হবে।

পাড়ায় ঢুকতেই, বিক্রমের মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগেই সে এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে চাইছিল—এই কথাটা পাড়ায় রটে গেলে লজ্জার শেষ থাকবে না। বাড়ির মুখে, গেটে হাত রেখে দাঁড়িয়ে দেখল, অন্ধকারে মায়ের ছায়া। বারান্দার বাল্বটা কেটে গিয়েছে।

—বাবু কিছু হল?

ঘাড় নামিয়ে বিক্রম বলল—আমি কিন্তু চেষ্টা করেছিলাম।

৪

বনির ডাকাডাকিতে, ঘুমটা ভেঙে গেল। বিক্রম উপুর হয়ে শুয়েছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বনি দাঁড়িয়ে । জানলা দিয়ে তেরচা রোদ এসে মুখে পড়ছে, দেখেই মনে হয় বিক্রমের মুখে আলোর স্রোতে এসে ঝাপটা মারছে!

—কি রে?

—পাবলুদা এসেছে। তুই কথা বলে নে।

—এতো সকালে!

—দাদা, ক'টা বাজে দেখ? ন'টা। এর পরেও বলবি?

—একদম টের পাইনি! আচ্ছা শোন, ওর কি সময় আছে?

—অত জানিনা, তবে তাড়া আছে। তোকে কিছু একটা বলতে এসেছে।

—আচ্ছা। ডাক।

বিক্রম ভাবল—এই সকালে কিসের জন্য এসেছে! পাবলু ছেলেটা বেশ। তবে কি আবার পিকনিক! ম্যানে আবার গাদাগুচ্ছের খরচ! মানে আবার আমাকে মিথ্যা বলতে হবে। আজ হলে বলব, শরীর খারাপ। আগামি কাল হলে বলব থাকব না।

পাবলু ঘরে এসে বিক্রমের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। বিক্রম

খালি গায়ে শুয়ে, শেষ রাতে পাতলা চাদরটা গায়ে টেনে নিয়েছিল; অগোছালো দেখেই বোঝা যাচ্ছে। বিক্রম বলল—বলরে...

পাবলু মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলল—একটা কথা আছে ভাই।

বিক্রম আসন হয়ে বসল---বলরে, যা বলবার জন্য এসেছিস।

পাবলু—দেখ, আমি জানি তুই টিউশনি করিস। বাংলা অনার্স নিয়ে পড়েছিস। এম এ করেছিস। তাই ভাবছি, কি বলব?

—আরে ভাই, যা পাই টিউশনি করে তাতে সংসারে চলে না। বস, ডিগ্রি এখন গড়াগড়ি খাচ্ছে। যদি কিছু বলতে চাস, বলে দে।

—বিক্রম আমার হাতে একটা চাকরি আছে। যদিও তোর যোগ্যতা অনুযায়ী কিছুই না।

বিক্রম খাট থেকে পা ঝুলিয়ে নামল।

—কাজটা বল! কী করতে হবে?

—লেবার হেড। বুঝলি, আমার মামাই কাজটা এনেছেন। দক্ষিণ কলকাতাতেই, বা রাজারহাট। একটা কনস্টাকশন হচ্ছে। তোকে লেবারগুলোকে খাটাতে হবে। স্যালারি সাত হাজার। চলবে ভাই?

—টাইম?

—সকাল এগারোটা থেকে বিকেল চারটে। ভালোও কাজ করলে সুপারভাইজার হয়ে যেতে কতক্ষণ। কিছু বল। আসলে অন্য একজনের করবার কথা ছিল, সে চাইছে না। লেবারদের সঙ্গে মাঠে থেকে কাজ, তাতেই আপত্তি।

বিক্রম জানলা দিয়ে রাস্তা দেখছিল। বাচ্চা ছেলেগুলো কুমীর-ডাঙা খেলছে। বিক্রমের মনে হল, জীবনটাই এমন, কেননা গত রাতে গঙ্গার বুকে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। আজ সকালে কাজ তার কাছে এসে ঝাঁপাচ্ছে! সে জলে ডুবতে চেয়েছিল। জীবন তাকে ডাঙা দিচ্ছে!

বীথি মেয়েটাকে বলতে হবে, সে যদি না বলত, তবে হয়ত বিক্রমের আরেকটা দিন দেখা হত না! আরেকটা দিন বেঁচে আছে বলেই কাজটা পেয়ে গেল! এই দিনটুকুর জন্য বীথিকে ধন্যবাদ।

—কিরে ভাই, মামাকে কী বলব?

—ধন্যবাদ জানাবি। আমি রাজি।

অনেক রাতে, ম্যাসেঞ্জার বিক্রম লিখল,

—বীথি আমি একটা চাকরি পেয়েছি।

---হুম।

---বীথি আমি মিথ্যা বলেছি। আমি কোন ব্যবসায়ী পরিবারের ছেলে নই। তবে ভদ্র ঘরের সন্তান।

—আমি জানি। তোমার কবিতাই, তোমার পরিচয়।

—আমি যে মিথ্যা বললাম। তুমি খারাপ ভাবলে না?

—যাকে ভালোবাসি, তাকে সবটা নিয়েই বাসতে হয় ভালো। তোমার সততা তোমার কবিতা, কান্না, অসহায়তা। আমি এইসব কিছু দেখেছি। ভালোবেসেছি। তাইতো তোমাকে আপন করে নিতে চাই।

—বীথি বিশ্বাস হচ্ছে না! তুমি কি স্বপ্ন? আমি ছুঁয়ে দেখতে চাই।

—একদিন দেখা হবে।

—কবে?

—ধরে নাও সামনের মাসে এক রবিবার, বাগবাজারের ঘাটে। বিকেল সাড়ে পাঁচটায়।

—নিশ্চিত তো।

—হুমম, আমি ফোন নম্বর দেব।

—ভুলে যাবে নাতো?

—তোমার তাই মনে হচ্ছে?

—অনেকেই, তোমাকে মেসেজ করে। তাদের সকলের কথা শুনে আমাকে ভুলে যেতেই পারো!

—তারা সবাই তোমার মতন কবিতা লিখতে পারে না। স্বপ্ন দেখতে শেখেনি।

—আমি দেখা করতে চাই।

—সব হবে।

—কবে?

—সময়। খুব তাড়াতাড়ি, বিক্রম আমাকে কিছুদিন সময় দেবে?

—সামনের মাসে, মনে থাকে যেন।

—থাকবে। আমি এত সহজে ভুলি না।

—নম্বরটা।

—আমি ঠিক সময়ে পাঠিয়ে দেব। দেখা হবেই।

৫

বিক্রম ঘাটে দাঁড়িয়ে দেখছিল, চারপাশ বিকেলের শান্ত আলোয় ভীষণ ক্লান্তিহীন লাগছে। পাখিরা উড়ে যায়। তাদের পালকের অন্তর্ভেদী রন্ধ্রে-রন্ধ্রে বিকেলের নম্র আলোর রেশ, বাসায় ফিরবার উদগ্রীব তাড়না। বিক্রম দেখছিল। তারপর মনে মনে ভাবল—মেয়েটা চিনে আসতে পারবে তো? কাঁধে

হাত রাখল কেউ, নরম হাতের ছোঁয়া। বিক্রম ফিরতেই দেখল, মাঝারি উচ্চতার ফর্সা, গালে টোল পড়া বীথি। বিকেলের হলুদ আলোয়, সালয়ায়ার কামিজটা আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ফেসবুকের থেকেও আরও বেশি জীবন্ত মনে হচ্ছে! দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে নিতে ইচ্ছা করছে। বিক্রম এমন মেয়ের স্বপ্ন দেখত।

বিক্রম বলল—ওখানে গাছ-গাছারি আছে, ছায়া পাবে। চলো।

ওরা দুজন একটা নির্জন ঘাটে গিয়ে বসেছে। সিঁড়িতে বীথি বসে আছে। কিছুটা উপরে বিক্রম; হাত ধরে বলল,

—বীথি, মানুষ কেন ভালোবাসে?

বীথি অন্যমনস্ক থেকে বলল—আমার মনে হয়, ভালোও না বেসে থাকতে পারে না। তাই বারংবার ভালোবাসার কাছে ফিরতে হয়।

—সব ভালোবাসা কি তার পরিণতি খুঁজে পায়?

—পেতে পারে? না, কখনই পেতে পারে না। পৃথিবীতে কত রকমের চাহিদা আছে, সবরকম চাহিদাই তার নিজের মতন সম্পর্ক তৈরি করে নেয়।

বিক্রম, বীথির ডান হাত নিজের কনুইয়ের সঙ্গে ঘেঁষে নিল। বলল—আমিতো মরেই যেতাম। ভাগ্যিস তুমি বাঁচিয়ে তুললে।

—আমি তোমায় বাঁচিয়ে তুলিনি? আমি শুধু তোমায় আরেকটা নতুন ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে বলেছি।

—আমি ভেবেছিলাম, পথ বুঝি শেষ হয়ে এলো!

—বিক্রম, এই যে একটা দিন ফুরিয়ে যায়। রাত নামে। তারপরেও ভোর হয়ে যায়। এই কথা সবাই বলে। কিন্তু তাও আমরা রাতকে ভয় পাই। ভাবি এই রাত খুব বড়।

—হুম। সত্যিই।

—রাতের গভীরতায় আমাদের বিশ্বাস আছে, রাতকে তুমি ভালোবেসে বিশ্বাস করে দেখো, দেখবে প্রতিদিন রাত ফুটবে।

—বীথি, আমায় খুব ভালোবাসতে পারবে না?

—হুম।

—বীথি একটা কথা বলব?

—বল।

—আমাকে ছেড়ে যেও না...

—বিক্রম, আমি ভালোবাসায় বিশ্বাসী, শর্তে নয়।

—বীথি, আমি ভালোবাসতে চাই। তুমি আসবে?

বীথি দেখল, বিক্রমের চোখ দুটোয় সন্ধ্যার ছায়া পড়েছে। বীথি বলল,

—যদি আমি বলি, আমার হাতে আর মাত্র সময় ৬ মাস। বিশ্বাস করবে?

বিক্রম, বীথির কথা শুনে কিছুটা অবাক হল। বলল—মানে?

—কেমো শুরু হবে। পরপর। কোমর থেকে ব্যথা শুরু হয়। আমি ডাক্তারদের কথা মতন আর ছয়মাস বাঁচব। বোনম্যারো ক্যান্সার। আমার রক্ত কোষ প্রতি মুহূর্তে শুকিয়ে আসছে। আমি ক্রমশ ত্বকের রং হারাবো। এই রাত্রিবেলা আমি ঘুমোতে পারি না। স্পাইনাল কডটা ক্রমশই যেন কেউ গিলে নিচ্ছে! স্নায়ুর সমস্যাও দেখা যাচ্ছে।

বিক্রম প্রথমে কিছুতেই মানতে পারল না। দু'হাত দিয়ে মুখটা ঘষল। বলল—বীথি, আমি যে অন্যকিছু ভেবে এসেছি, অনেক স্বপ্ন আছে! এত কষ্ট তোমার, আমাকে একবারের জন্য বুঝতেও দেওনি! তাহলে তুমি আজ কেন এলে?

বিক্রমের মুখটা বাচ্চা শিশুর মতন হয়ে উঠেছে। বীথি থুতনিতে হাত রেখে বলল—যারা অতীত নিয়ে বেঁচে থাকে, জীবন তাদের জন্য নয়। আমি যেই দিন এই পৃথিবী ছাড়ব, আমি চাইব অনেক ভালোবাসার মানুষ ছড়িয়ে থাকুক। সেই সব মানুষরা আমার প্রেমিক হয়ে থাকবে। আমি তাদের মধ্যেই বেঁচে থাকব। যেদিন প্রথম তোমার কবিতা পড়েছিলাম, মনে মনে চেয়েছিলাম তুমি আমার ভালোবাসার মানুষ হও। জানও এই যে তুমি কষ্ট পাচ্ছ। তাও বেঁচে থাকার জন্য লড়বে, এমনটা মানুষ ভালোবাসলেই করতে পারে। আমার প্রেমিক এত দুর্বল হতে পারে না।

বিক্রম দেখল ঝুপ করে কাউকে কিছু না জানিয়েই সন্ধ্যা নেমেছে। গঙ্গার বুকে স্রোতের উপর অন্ধকারের স্রোত বইছে। বীথি এক দৃষ্টিতে, বিক্রমের দিকে তাকিয়ে। আচমকাই নিজের ঠোঁট, বিক্রমের ঠোঁটের উপর রাখল। চুমু খেল। আদিম ও অকৃত্রিম। এদিকটা বেশ ফাঁকাই থাকে। ছাব্বিশ বছরের যুবকের ঠোঁটে পঁচিশ বছর বয়সী এক যুবতীর তীব্র চুম্বন, এই মুহূর্ত দুর্লভ; পৃথিবীর একান্ত পরিচিত দৃশ্য।

একমাস বাদে, বিক্রম ফোন পেল। বীথি ডেকেছে। আজই বেলঘরিয়ার বাড়িতে যেতে হবে। আজ রবিবার। এখন সকাল সাতটা।

যখন বাড়ির সামনে দাঁড়াল, দেখল তার মতনই জনা বিশেক ছেলে দাঁড়িয়ে। হাতে ফুল নিয়ে। বিক্রমের লজ্জা লাগল। সে কিছুই আনতে পারেনি, আচমকা ফোন পেয়েই কিছুটা উদভ্রান্তের মতন ছুটে এসেছে। ঘড়িতে এগারোটা।

বিক্রমের পকেটে শুধু ভাঁজ করা কয়েকটা কাগজের পাতা। কবিতা লিখে এনেছে।

বিক্রম সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠল। ঘরের বাইরে, বীথির মা দাঁড়িয়ে, ইশারা করে ভিতরে ঢুকতে বলল। ঘরের ভিতর বিছানায় শুয়ে বীথির কেমোয় ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া শরীর। বিক্রমকে দেখে ডাকল। বলল—বিক্রম, চোখে জল কেন? আমি চললাম। তোমরা থাকলে। তোমরা এমন ভাবেই ভালোবাসতে শেখাবে। মানুষ বেঁচে থাকে ভালোবাসায়।

বিক্রম বলল—তোমাকে এমন অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি না। তুমি বলেছিলে, ছেড়ে যাবে না।

বীথি—আমি কোথাও যাচ্ছি না। তুমি না প্রেমিক, বীথির প্রেম এত দুর্বল নয়। আমি খুব চালাক। তোমাদের ভাঙিয়ে বেঁচে রইব। কেমন ফন্দি বলো? আমি জানতাম, আমি একটা গোটা জীবন পাব না। আমি কিন্তু ভালোবাসতে ভুলিনি। কত প্রেমিক আমার। আমিই তো বেঁচে রইব।

বিক্রম---এইসব কথা মন ভোলানো। আমায় বাচ্চা ভেবেছ?

বীথি—আমি যতটা সময় পেয়েছি, নিঃশর্তভাবে বেঁচেছি। আমি চাই, আমার প্রেমিকরা তেমনভাবেই যেন জীবনকে দেখে। আমার প্রেমও তাদের উপর শর্ত না হয়। ভালোবাসলে, শর্ত ভুলে থাকা যায়। তারপর বলল,

—আমরা সবাই যে মৃত্যুমুখি। ক্ষয় মানে মৃত্যু, তবে মৃত্যু মানে হারিয়ে যাওয়া নয়। তুমি তোমার কবিতাটা শোনাবে?...

বিক্রম—কোনটা?

বীথি—সেই যে, সেই দিন, ঘাটে শোনাবে বলেও ভুলে গেলে, তোমার লেখা সেরা কবিতা। আমিও সেদিন, তোমার ঠোঁটের উষ্ণতায় কেমন যেন সব কিছু ভুলে গিয়েছিলাম! শোনাও না...

‘এই পৃথিবীতে তোমার—আমার জন্মের আগে
মৃত্যু, দেখেছিলে প্রথম আলো
তুমি চলে গেলে, নিরুত্তাপ রাত্রিবাসে;
থেকে যাবে তোমাকে কাছে পাওয়ার দু’চার মুহূর্ত।
আমি নাস্ত্রানামুদ নই অথবা আর্যভট্ট,
তাও আজ তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে এতটুকু বলতে পারি—
মৃত্যু কখনো ভালোবেসে করেনি আড়ি...
সে আজও প্রথম প্রেমের মতন, সহজ—সরল, পবিত্র।’

বিক্রম কাঁদছে। বীথির ডানহাতের কনুইয়ের সামনে, মাথা পেতে—বাচ্চা ছেলের মতন কাঁদছে।

বীথি, বিক্রমের মাথায়, ক্লান্ত কম্পিত হাত দিয়ে চুলে বিলি কাটছে। বীথি ভাঙা স্বরে বলল—ছিঃ, কাঁদতে নেই। আমি তোমার কবিতার সঙ্গেই বেঁচে থাকব। আমাকে ভেবে যতবার কাগজের বুক চিড়বে, কলমের আঁচড়ে; যতবার আমি বেঁচে উঠবো। ভালোবাসার মৃত্যু হয় না। এই পৃথিবীতে ভালোবাসার মৃত্যু হতে পারে না। পৃথিবীর শেষ দিন পর্যন্ত আমি থাকব না। তুমিও থাকবে না। কিন্তু আমাদের এই ভালোবাসা থেকে যাবে। মানুষের ভালোবাসাই থেকে যায়। মৃত্যু মানুষকে কাঁদায়। আর নতুন শিশুর জন্মের খবর পৃথিবীকে বাঁচতে শেখায়। তুমি ভেবে বলও, দুটো অনুভূতির মধ্যে তুমি কোন মুহূর্তের জন্য বাঁচতে চাইবে? ঘরের বাইরে যারা রয়েছে, তারাও আমার প্রেমিক। দেখো আমি আর মাত্র কিছুক্ষণ, অথবা কয়েকদিন বা বড়জোর একমাস। তারপর এই ক্লান্ত, অ সুস্থ, বীথিকে আর দেখতে পাবে না। তাই বলে চাইলেই ভুলতে পারবে না। এরা সবাই জীবনে পরাজয়কে বড় করে দেখে স্বপ্ন দেখতে ভুলে গিয়েছিল! আমি এদের চোখে স্বপ্নের বারুদ দিয়ে দিয়েছি। তুমিও সেই বারুদ নিয়ে এখান থেকে ফিরবে। আমায় ভুল বুঝো না। আমি দুর্বলের প্রেমিকা হতে চাই না। যে সাহসী সেই ভালোবাসতে পারে।

‘...সোনা...ঘরের বাইরে আরও অনেকে অপেক্ষা করছে, ওদের ভিতরে আসতে দাও আমার হাতে সময় খুব কম...’

আগমনী

শেখর ভারতীয়

টালা ব্রিজে ওঠার মুখেই ব্রিজ ঘেঁষে একটা সাততলা অ্যাপার্টমেন্ট ''আগমনী''। তিনতলার পশ্চিমদিকের জানলাটা খুললেই বড় পোস্টার। এবারে পুজোর থিম ''শিউলি বনে দুর্গা এল''। কাশফুল রঙের পর্দাটা সরিয়ে দিয়ে সেই দিকে তাকাল শিউলি। না কিছুই পড়া যাচ্ছে না, গতবছর লক্ষ্মী পুজোতে চোখের বয়স হয়েছে ৫৩, হাতড়ে খুঁজে আনে চশমাটাকে, হ্যাঁ, এইবার সব পরিষ্কার। পালঙ্কের উপর অগোছালোভাবে পড়ে তুতুনের নতুন কেনা জিন্স, বরের শার্ট, শিউলির ৪ খানা শাড়ি। শিউলি নিতে চায়নি, তুতুন জোর করে দিয়েছে। তুতুন এখন ২৫, নামী কোম্পানিতে ইঞ্জিনিয়ার, মাকে শাড়ি কিনে দিতে তাই এতটুকু কার্পণ্য করেনি সে। পোস্টার থেকে চোখ নামায় শিউলি, পালঙ্কে এসে বসে, নতুন কেনা শাড়িগুলোতে পরম যত্নে হাত বোলায়, নাকের সামনে তুলে ধরে না, সেই মিষ্টি গন্ধটা নেই, সেই গন্ধটা যেটা আজ থেকে...

(২)

আনমনা হয়ে যায় শিউলি। তখন সেই বছর ২৭-এর এক মেয়ে। সংসার পেতেছিল ঝাড়গ্রামের ভাড়া বাড়িতে, প্রেমিক বর টিউশন করে, ছেলের বয়স ৪। পুজোতে অনেক কষ্ট করে ওরা শুধু ছেলের জন্য নতুন জামাটা কিনতে পারত, তাও সপ্তমীর সন্ধ্যায় গিয়ে, তবে শিউলি না গেলে ছেলের জামা পছন্দ হত না। তখন পুজোর আনন্দটা অন্যরকম ছিল। শিউলিদের ভাড়াবাড়ির উঠোনে ছিল একটা শিউলি গাছ, সেটা মহালয়া আসার কয়েকদিন আগে থেকেই উঠোন জুড়ে ফুল ফেলে জানান দিত দুর্গা আসার। শিউলিও নিজের মতো করে সাজত পুজোর জন্য। সেবার টিউশনের টাকা সময় মতো পেয়ে যাওয়াতে একটা কমদামী শাড়ি গিফট করেছিল রুদ্র। শিউলির বান্ধবীরা চেয়েছিল নবমীর দিন রাত্রিটা ওদের সঙ্গে ঘুরুক শিউলি। শিউলিও যে চায়নি এমনটা নয়, অষ্টমীটা বর, ছেলের সঙ্গে ঘুরে নবমীটা রেখেছিল বান্ধবীদের জন্য। নবমীর দিন বান্ধবীরা দরজায় এসে ডাকাডাকি শুরু করে, কিন্তু তুতুনের জেদ আজও ও মা, বাপির সঙ্গে পুজো ঘুরবে। অনেক বুঝিয়েও কোন লাভ হয়নি, অগত্যা বান্ধবীরা মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে গেছিল।

এখন আর অষ্টমীর পুষ্পাঞ্জলী ছাড়া পুজো দেখতে বেরোয় না শিউলি।

(৩)

তুতুনের পুজো শিডিউল রেডি সেই কবে, পঞ্চমী কলেজ ফ্রেন্ড, সপ্তমী স্কুলবন্ধুদের জন্য, অষ্টমী-নবমী প্রেমিকাকে দেওয়া, দশমী অফিস কলিগদের সঙ্গে। এতে আজ আর

শিউলির জায়গা নেই, বরের সঙ্গে বেরোতেই পারে শিউলি, কিন্তু সেদিনের সেই টিউশন পড়ানো প্রেমিকটা কবে যেন ''ফিজিক্সের প্রফেসর'' হয়ে গেছে। অষ্টমীর সকালে লুচি ভাজতে ভাজতে ছেলেকে বলে শিউলি, তুতুন লুচি খেয়ে বেরোস।

—না মা আজ হবে না। আজ শ্রাবণীদের বাড়িতে নেমন্তন্ন। পাঞ্জাবীর উপর বডি-স্প্রে ছড়াতে ছড়াতে জবাব দেয় তুতুন।

কিছুটা চুপ করে আবার লুচি ভাজতে থাকে শিউলি।

মণ্ডপে প্রেমিকার আঙুল নিজের হাতে শক্ত করে ধরে দাঁড়ায় তুতুন। সামনেই এক বাচ্চা একইভাবে শক্ত করে ধরে আছে তার মায়ের আঙুল আর বাচ্চাটির মায়ের চোখ মুখে সে কি খুশি। তুতুনের কি মনে হয়, বাচ্চাটির সঙ্গে কথা বলে।

—কি নাম তোমার?

—তুতুন। তোমার নাম কি?

—আমারও নাম তুতুন।

—এটা কে হয়? মায়ের দিকে আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করে বড় তুতুন।

—আমার মা।

আর তোমার বন্ধুরা?

—বন্ধুদের সঙ্গে এতদূর আসিনা, ওদের সঙ্গে পাড়ায় ঠাকুর দেখি।

ওহ।

-তুমি কার সঙ্গে ঠাকুর দেখতে এসেছো? তোমার মা কোথায়?

(৪)

—মা লুচি ভেজে দেবে?

—কি রে, এই যে বললি রাত্রে খেয়ে ফিরবি? ফিরে এলি যে?

শিউলি অবাক হয়, তড়িঘড়ি করে লুচি ভেজে খাওয়ায় ছেলেকে। পেছন থেকে মাকে জড়িয়ে ধরে তুতুন, মা আজ রাত্রে আমাকে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে?

অবাক হয় শিউলি, আমি তা ভিড়ে যাব না তুতুন। না, এবারেও শেষমেষ ছেলের জেদের কাছে হার মানে শিউলি, সন্ধ্যেবেলায় নতুন শাড়ি পরতে গিয়ে দেখে, নতুন শাড়িতে সেই পুরনো গন্ধটা ফিরে এসেছে, সেই চেনা মিষ্টি গন্ধটা।

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য্যের বিষয় সর্বধর্ম সমন্বয়ের সোল এজেন্ট এবং ডিষ্ট্রিবিউটার্স শুধু হিন্দুরাই। এই নির্বোধ প্রেরণা ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে পর্যন্ত বিকৃত করে দেখাবার দুঃসাহস সৃষ্টি করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাস্তবিকপক্ষে পূর্বভারতে হিন্দুধর্ম রক্ষা করলেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ চিকাগোয় গিয়ে বিশ্বের সামনে হিন্দুত্বের বিজয় পতাকা তুলে ধরলেন। সেই বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন শ্রীরামকৃষ্ণকে হিন্দু নয় প্রমাণ করতে, সেক্যুলার সর্বধর্মসমন্বয়কারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। মাদ্রাজ রামকৃষ্ণ মিশন মহম্মদের বাণীর একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছেন, যাতে কাফেরদের সম্পর্কে নিষ্ঠুর নির্দেশগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে। জনৈক 'হাফিজ' এর সংকলন করেছেন। হিন্দুর টাকায় এগুলো বিভিন্ন ভাষায় ছেপে হিন্দুদের মধ্যেই বিতরণ করা হচ্ছে। রামকৃষ্ণ মিশনের সাধ্য আছে জামাতে ইসলামী জাতীয় কোন মুসলিম ধর্মীয় সংস্থাকে দিয়ে গীতা, উপনিষদ কিংবা কথামৃতের প্রচার করানো? যদিও বইগুলো সকলের জন্যই লেখা, তা পারবেন না। আত্মসমর্পণ করতে হবে শুধু হিন্দুকে। ঐক্যের দায় শুধু হিন্দুর।—শিবপ্রসাদ রায়

মেঘ ও রোদ্দুর

ঝুমা বর্মন

ছাদের উপর দাঁড়িয়ে খোলা আকাশের দিকে একটা দলা পাকানো সিগারেটের কালো ধোঁয়া ছেড়ে দিলো সুদীপ্ত। আরও কয়েকবার টান দিতেই সিগারেটটা ক্রমশ ছোটো হয়ে আসছে। সুদীপ্তর জীবন আজকাল সিগারেটের মতন ধীরে ধীরে ছোটো হয়ে আসছে। ভেতরের শেকড়টা পুড়ে কবেই তো ছাড়খার হয়ে গেছে... এখন নিঃশ্বাস নিতেও যেন ভয় হয়...বুকের সেই চাপ চাপ জমাট বাঁধা কষ্টের কালো ধোঁয়া বাইরে বেরিয়ে এসে জীবনটাকে ওলটপালট করে দিয়ে যাবে...

আগের চঞ্চলতা, ব্যস্ততা, ভালোলাগা হারিয়ে গিয়ে একটা ঢিলেঢালা জীবন নিয়ে বেঁচে আছে। সুমিত্রার হাত ধরে চুপিসারে সুদীপ্তর জীবনে বসন্ত এসে ধরা দিয়েছিল। সেই বসন্ত উৎসবের দিন সুদীপ্ত সুমিত্রাকে প্রথম দেখেছিল, কাদা কাদা ভিড়ের মাঝে চোখ ফেরাতে পারছিল না। বাসন্তী রঙা শাড়ির সঙ্গে ম্যাচিং করা নানা রঙের রেশমি চুড়ি, চুলের খোঁপায় বেল ফুল নাকি রজনীগন্ধা। বুঝতে একটু সময় লেগেছিল। সে যেই ফুল হোক, একপলকেই সুদীপ্তর মনে ঝড় তুলে দিয়েছিল। বসন্তের ঝিরঝিরে বাতাসের দোলায় পলাশ, কৃষ্ণচূড়ার মতন সুমিত্রার জন্য সুদীপ্তর মন-প্রাণ কেঁপে ওঠে। সম্পূর্ণ এক নতুন অনুভূতি নিয়ে জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের দিকে পথ চলা শুরু করে সুদীপ্ত। বেশ চলছিল সব কিছু, হঠাৎ এক অজানা অশনিসংকেতে বসন্তের সব ফুল ঝড়ে মাটিতে পড়ে যায়। নিমেষে তার মনের ক্যানভ্যাস এক ঘন কালো মেঘে ঢাকা পড়ে যায়...

সুমিত্রা এখন তার পছন্দের মানুষটির সঙ্গে এক স্বপ্নের জাল বোনাতে ব্যস্ত। কিন্তু সুমিত্রা যে মায়াজালে তাকে আটকে দিয়ে গেছে সেই জাল কাটার মতন প্রাণশক্তি সুদীপ্তর নেই। এখন আবার কুহু এসে সুদীপ্তর মনে পুনরায় আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করছে। যে আগুনে সে স্বেচ্ছায় ঝাপ দিয়েছিল সেই আগুনের আঁচ তাকে আর স্পর্শ করতে পারবে না। কুহু যতই সিধ কাটার চেষ্টা করুক তার মনের অন্দরমহলে প্রবেশ নিষিদ্ধ। কুহুর এই গায়ে পড়া স্বভাবটা সুদীপ্তর একদম পছন্দ নয়। যখনই সে মন হালকা করার কথা ভেবে ছাদের উপর দাঁড়িয়ে থাকে তখনই এই কুহু এসে তার ভাবনায় ব্যাঘাত ঘটায়। পাশের বাড়ির তেতালায় নতুন ভাড়া এসেছে কুহুরা। কোনোদিন কথাও বলেনি সুদীপ্ত। কিন্তু এই কুহু যে তার জীবনকে অতিষ্ঠ করে দিচ্ছে মাঝে মাঝে সেই কথা যেন চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে তার...সুদীপ্ত বসন্ত পার করে এসেছে, বসন্তের রূপ-রস-গন্ধ সব যেন তার নখদর্পণে। দূর থেকেই বুঝে নিয়েছে সুদীপ্তর জন্য যে কুহুর মনে বসন্তের রং লেগেছে। এতে তার কিছু এসে যায় না। সে এখন পরিপক্ক। চিলেকোঠায় দাঁড়িয়ে মেয়েটা নানা অঙ্গভঙ্গি করে ইশারা দেয় তাকে। কখনও খোলা চুলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একমনে কবিগুরুর গান গেয়ে ওঠে—আমারও পরাণে যাহা চায় / তুমি তাই গো...মিষ্টি কোয়েলের মতন সুমধুর কণ্ঠ কুহুর। নিজের অজান্তেই কখনও কখনও সুদীপ্ত কুহুর গানের তরীতে ভেসে সুমিত্রার কাছে চলে যায়। সুমিত্রাকে সে এখনও ভালোবাসে, ভুলতে পারবে না। সুমিত্রা নরম কোলে মাথা রেখে এখন হয়তো তার পছন্দের পুরুষটির সঙ্গে প্রেমের বন্যায় ভেসে যাচ্ছে, উফ! কথাটি ভাবলেই যেন সুদীপ্তর স্নায়ুর চাপ বেড়ে যায়। কুহুর গানে তখন ছেদ পড়ে। সুমিত্রা তাকে ছেঁড়া টাকার মতন অচল করে চলে গেছে। কুহুর কণ্ঠ তখন তার কাছে বিষের বাঁশির মতন মনে হয়, এই মেয়েটি নিশ্চই ছলাকলা জানে, তার মন পড়ে নিয়েছে এইজন্য সে ইচ্ছে করে আঘাত করে যাতে সুদীপ্ত আরও বেশি করে কষ্ট পায়...এরপর কুহুর দিকে একবার তাকিয়েই রাগে, ক্ষোভে, ঘৃণায় ছাদ থেমে নেমে যেত। সেদিন বৃষ্টির মধ্যে সুদীপ্ত গাড়ি থেকে নামতেই দেখেছিল তার পায়ের সামনে ধপ করে একটা মোটা বাঁধানো বই এসে পরলো। সুদীপ্ত একটু মাথা উঁচু করে দেখলো কুহু কাচুমাচু মুখ নিয়ে চিলেকোঠার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে সময় লাগেনি তার হাত থেকেই পড়ে গিয়েছে। ভদ্রতার খাতিরে বইটি তুলে নিয়ে ফেরত দিতে গেছিল ওমনি ছাদ থেকে বিদ্যুৎ গতিতে নেমে এলো কুহু।...একটু হাসি হাসি মুখ নিয়ে সুদীপ্তর দিকে হাত বাড়িয়েই বলেছিল,

—'দিন বইটি।'

...সুদীপ্ত সেই দিন প্রথম কুহুর মুখটা ভালো মতন দেখেছিল, গায়ের রং তেমন ফর্সা নয় বলা যায়,কৃষ্ণবর্ণই। সুদীপ্ত শশব্যস্ত হয়ে বইটি কুহুর হাতে দিয়েই পিছন ফিরে চলেই যাচ্ছিল, শুনতে পেল, কুহু তাকে বলছে,

—'আমি কুহু, আপনার নাম কি জানতে পারি?'

...সুদীপ্ত চোখে মুখে একটা বিরক্তির ভাব নিয়েই উত্তর দিয়েছিল,

—সুদীপ্ত মুখার্জী।

কুহু সুযোগ হাতছাড়া করতে চায় না, সঙ্গে সঙ্গে একটু আহ্লাদীপনা মুখ নিয়ে বলল,

—'সুদীপ্তবাবু আপনি এই বইটি বাড়ি নিয়ে যান, ধার হিসেবে দিচ্ছি। সমরেশ মজুমদারের বই,প্রেমের বই...'

...কুহুর কথা শেষ হতে না হতেই সুদীপ্ত একটা চাঁছাছোলা দৃষ্টি নিয়ে কুহুর দিকে তাকিয়ে বলে উঠেছিল,

—বই পড়ায় আমার কোনো ইন্টারেস্ট নেই।

কুহু যেন আবদারের সুরে বলেছিল,

—কেনো? প্রেমের দরকার নেই বুঝি।

সুদীপ্ত একটু ধমকের সুরেই বলেছিল।

—আমার পছন্দ অপছন্দ জেনে আপনি কি করবেন। যতসব ন্যাকাপনা।

সুদীপ্তর এই উত্তরটা মনে হয় আশা করেনি কুহু, মুহূর্তের মধ্যে মুখটা সন্ধ্যার আকাশের মতন ম্লান হয়ে যায়। একটা বিষণ্ণ ছায়া দেখতে পাচ্ছিল সুদীপ্ত তার মুখে।

অভিমান ছড়ানো একটা দীর্ঘশ্বাস ফুটে উঠে কুহুর ঠোঁটে,

—এত অপছন্দ।

কথাটি বলে আর দাঁড়িয়ে থাকেনি কুহু, দৌড়ে চলে গেছিল।

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় সুদীপ্ত একাই দাঁড়িয়ে ছিল ছাদের ওপর। ভাগ্যিস ওই মেয়েটা নেই। সুমিত্রাকে ঘিরে তার মনের মধ্যে অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। এক দমকা হাওয়ার মতন সুমিত্রা তার জীবনে ঢুকে পড়ে এই একুশ বছরের অভ্যস্ত নিয়মমাফিক বাঁধাধরা জীবনের গতিপথ বদলে দিয়ে সে যে কেনো এমনভাবে চলে গেল তার উত্তর আজও অজানা। এখনও যদি সুমিত্রা তার সামনে এসে ধরা দেয় সে তাকে ফিরিয়ে দিতে পারবে না, এখনও তার ভালোবাসায় ছোঁয়া পেতে চায়।...প্লিজ সুমিত্রা ফিরে এসো, আমি আর কষ্ট সহ্য করতে পারছি না, ভুলবো কিভাবে। তোমার ওই হাসি, মায়া লাগানো চোখ জোড়া, তোমার চুলের সুগন্ধিতে যে বড্ড মাদকতা আছে। আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি ফিরে এসো...মনে মনে সুমিত্রার কল্পনায় ভেসেই যাচ্ছিল, ঠিক সেই সময় ওই নাছোড়বান্দা মেয়েটি একেবারে তার বাড়ির ছাদে চলে আসে। অবাক চোখে সেদিন প্রশ্ন করেছিল সুদীপ্ত,

—কি ব্যাপার আপনি! এখন...এখানে।

কুহু মাথা নীচু করেই উত্তর দিয়েছিল।

—আপনি বইটি পড়বেন, ধার হিসেবে নিন।

কর্কশ গলায় ঝাঁঝিয়ে ওঠে সুদীপ্ত—কি ছেলেমানুষি করছেন। কুহু চোখটা একবার তুলেই বইটি তার হাতে প্রায় জোর করেই গুঁজে দিয়ে সেখান থেকে সেদিন পালিয়ে গেছিল।

আমাদের মন শাসন মানে না, তাকে বেঁধে রেখে আলোহীন কপাটের ভেতর ঢুকিয়ে রাখার চেষ্টা যতই করো, সে কোনো না কোনো ফাঁকফোকর খুঁজে বাইরে বেরিয়ে আসবেই। এই যে কুহুর পাগলামি, জোর করে সুদীপ্তকে বই প্রেমী করে তোলার চেষ্টা, কুহুর গুড় মিশ্রিত কণ্ঠের গান সব কিছুই সুদীপ্তর ভালো লাগতে শুরু করে। কুহু তার আঁচলে বেঁধে ফেলে তাকে। ফোনালাপ চলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, বিকেলে রিক্সায় চড়ে ঘুরতে যাওয়া, কুহুর গল্প মানেই উপন্যাসের নায়িকা-নায়ক-প্রেম-মিলন-বিচ্ছেদ নিয়ে কাহিনী শোনানো। আবার এক অচেনা বিকেলের সঙ্গে দেখা হলো সুদীপ্তর। কুহুর এই পাগলামি, ছেলেমানুষি, ছোটো ছোটো আবদার যে ধীরে ধীরে সুমিত্রার স্মৃতির জাল কেটে দিচ্ছে সুদীপ্ত পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল। সুদীপ্ত এখন একটা কনফিডেন্স লেভেল ফিরে পেয়েছে। কুহু তার হাত ধরে হাটতে চায়, এখন একটা পার্মানেন্ট ভরসার স্থান তার আছে। আগের মতন তাকে আর একাকীত্ব কাটানোর জন্য মন খারাপ করুক, অভিমান করুক, সময়ে অসময়ে মোবাইলের স্ক্রিনে জীবনে সুদীপ্তর গুরুত্ব অফুরন্ত, এই ভাবনা সুদীপ্তকে আনন্দ দেয়। ধীরে ধীরে সুদীপ্তও তখন কহুকে আগলে রাখতে চাইছিল, কোনো কিছুর বিনিময়ে সে তার গুরুত্বকে হারাতে চায় না। সুমিত্রার জন্য সে মাথার মধ্যে একরাশ চিন্তার ভার নিয়ে রাতের পর রাত না ঘুমিয়েই কাটিয়েছিল। এখন সে শান্তিতে ঘুমাতে পারে, কোনো হারানোর ভয় নেই শুধুই ভালোলাগার ছোঁয়া।

অন্ধকার রুমে শুয়ে কানে হেডফোন লাগিয়ে গান শুনছিল সুদীপ্ত। কুহুই রেকর্ড করে গানটি পাঠিয়েছিল।

'আমার একলা আকাশ থমকে গেছে
রাতের স্রোতে ভেসে
শুধু তোমায় ভালোবেসে
.....
তুমি চোঁখ মেললেই ফুল ফুটেছে হাওয়ার ছাদে এসে
.....

আমার ক্লান্ত মন ঘর খুঁজেছে যখন
আমি চাইতাম পেতে চাইতাম শুধু
তোমার টেলিফোন...'

আচমকা মোবাইল স্ক্রিনে ভেসে উঠলো একটা চেনা নম্বর। ফোন তুলে কারো শব্দ পাওয়া গেল না শুধু একটা নিঃশ্বাসের শব্দ, সুদীপ্তর বুকটা ধক করে উঠল। আবেগ চেপে রেখেই ফোনটা তুলেছিল...

—চুপ করে থাকার জন্য ফোনটা করেছো?

—কি চাই তোমার?

—হ্যালো, হ্যালো।

সুমিত্রা ফোনটা কেটে দিয়েছিল।

ছাই এর ভীতর যে আগুনটা চাপা দেওয়া ছিল ফোনটা না এলে টের পাওয়া যেত না। বাইরে তখন জ্যোৎস্না। আকাশে চাঁদ উঠেছে। কিছু কালো মেঘের টুকরো চাঁদের উপর দিয়ে আসা-যাওয়া করছে। তাতে একটা আলো আঁধারের সৃষ্টি হয়েছে। সুদীপ্তর মনেও তো কুহু—সুমিত্রার এক অদ্ভুত খেলা চলছে। কুহুকে সে ভালোবাসতে পারেনি শুধু ভালোলাগা এর বেশি কিছু নয়। এখন কুহুর সঙ্গে কথা বলতে গেলেই সুমিত্রার ফোন অপেক্ষায় থাকে। সুদীপ্তর বিরক্ত লাগে। সে জানে সুমিত্রা এখন তার খোঁচা দেওয়া কথাবার্তা দিয়ে ইনবক্সটা একবারে ডাস্টবিন বানিয়ে ফেলবে। ঈশ্বর কি বিচিত্র আমাদের জীবন যখন অন্ধকারে তলিয়ে যায় তখনই আবার চাঁদ সূর্যের আলো জ্বালিয়ে অন্ধকার দূর করে। কুহুকে কয়দিন ধরে ইগনোর করেছিল। তার ফোন রিসিভ করেনি সুদীপ্ত। সুমিত্রার ডিলিট করা ছবিগুলো আবার সংগ্রহ করতে হল। ফেসবুকের ব্লকটাও তুলে নেই। মনের গতিপ্রকৃতি যে সুমিত্রার দিকেই ঝুঁকতে চাইছে সেই উপলব্ধি প্রকাশ করতে ঘৃণা হচ্ছে। কিসের এত টান। ঘেন্না, ঘেন্না, শুধুই ঘেন্না সুমিত্রার জন্য। তবুও কেন মন খারাপ-ভালোলাগা-আনন্দ মিশ্রিত অনুভূতি কাজ করছিল তার মনের ভীতর! বুঝতে পারছিল না সুদীপ্ত।

ফোন করেছিল সুমিত্রা।

—হ্যালো! দেখা করবে কালকে?

—কেন?

—কেন মানে? উহুঁ খুব তো প্রেম করছো!

—তাতে তোমার কি?

সুমিত্রা কোন উত্তর না দিয়েই বলল,

—মধুবন পার্কে বিকেল বেলায় চলে এসো।

অর্ডার দিয়েই ফোনটা কেটে দিয়েছিল সুমিত্রা। বদ অভ্যাস কখনো যাবে না!

সুমিত্রার কণ্ঠে যে আবেগ-ভালোবাসা ছিল না, একটা অর্ডারের সুর ছিল। সুদীপ্ত বুঝতে পেরেও না করতে পারে নি। নেশা এত সহজে যাবে না। আগামীকাল কুহুর সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। কুহুর বায়না চিলাপাতা ফরেস্টের ভিতরে গিয়ে যে মহাকাল মন্দিরটি আছে সেখানে তাকে সিঁদুর পরিয়ে দিতে হবে। গোপনে বিয়ে করবে উপন্যাসের নায়িকার মতন। মধুবন পার্কের গেটের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল সুমিত্রা। একটা কালো শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে যাচ্ছে। দুই ধারে সারি সারি দাঁড়িয়ে আছে শাল-সেগুন-শিমূল গাছের ঘন বন। বিকেলের লাল আভা গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে উঁকি মেরে দেখছে তাদের দুজনকে। সুমিত্রার প্রতি ঘৃণা হচ্ছে দূরে যেতে পারছে না, পুরনো মদের নেশা অনেক বেশি। সুমিত্রার সেই মাদকতার নেশায় বুঁদ হয়ে আছে সুদীপ্ত। কুহু তাদের মিলনের মাঝে প্রধান অন্তরায়। কুহুর ফোনটা তুলেই তাকে আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলেছিল।

সুমিত্রার সেই চোখ, সেই ঠোঁট, সেই চুলের সৌরভ আগের মতই শিহরিত করে তুলেছিল তাকে, সুমিত্রা দাঁড়িয়ে আছে, নিষ্কলঙ্ক মুখটায় একটা যেন কুটিল হাসি অনুভব করছে সে, মনে হচ্ছে যেন দুহাত দিয়ে সুমিত্রার গলাটা টিপে ফেলে দিয়ে দৌড়ে কুহুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। সুমিত্রার বাঁচার কোনো অধিকার নেই। পোশাকের মতন পুরুষ বদলানো সুমিত্রারা ভালোবাসতে জানে না, পুরুষ তাদের কাছে পোষ্যর মতো পায়ে পায়ে ঘুরঘুর করবে। তারা ঘর বাধার জন্য কামুক, লোলুপ, মেরুদণ্ড ভাঙা পুরুষ চায়। না আর মায়া জালে আটকাতে পারবে না সুদীপ্তকে। কুহু অপেক্ষা করে আছে, বেলা শেষ হয়ে আসছে ফিরতে হবে তাকে। আজকে সুমিত্রার কাছ থেকে সে মুক্ত, সম্পূর্ণ মুক্ত।

সূর্য ডুবে যেতেই চারদিকে অন্ধকার নেমে এলো। পাখিরা সব ঘরে ফিরে যাচ্ছে। সুদীপ্ত এখনও ছাদের উপর রাখা আরাম চেয়ারটিতে শুয়ে আছে। শুনতে পাচ্ছে কেউ যেন তাকে ডাকছে। চোঁখ খুলেই দেখতে পেলো। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে একটা লাল টুকটুকে শাড়ি পরে দাঁড়িয়ে আছে সুমিত্রা। তার দিকে হাতটা বাড়িয়েই বলল,

—নাও, তাড়াতাড়ি ধরো।

সুদীপ্ত কুহুর দেওয়া বইটি বুকের উপর জড়িয়ে নিয়েই শুয়েছিল। বইটি টেবিলের উপর রেখে দিয়ে মাথাটা একটু নীচু করেই সুমিত্রার হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল। কিছু একটা ভাবছে সুদীপ্ত। সুমিত্রার সঙ্গে তার প্রেমের ঠান্ডা লড়াই চলছে। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে দুজনের মনেই সেই অদ্ভুত খেলা চলছে।

নীরবতার মাঝে দাঁড়িয়ে দুজনেই কিছুক্ষণের জন্য চুপচাপ হয়ে কিছু একটা ভাবছে। বাইরে যা অপ্রকাশিত।

কুহু সেদিন চলে যায়। আর কোনোদিন দেখা হয়নি সুদীপ্তর সঙ্গে...সুমিত্রা সেদিনও তার নোংরা জালে তাকে আবদ্ধ করে ফেলেছিল। প্রেগনেন্সির সাজানো নাটক করে মিথ্যা জালে আটকে দিয়েছিল সুদীপ্তকে। সেদিন ছটফট করে বাঁচার জন্য আপ্রাণ লড়াই চালিয়েছিল, কিন্তু সুদীপ্ত ব্যর্থ হয়। সুদীপ্তর প্রাণ ভোমরা তখন সুমিত্রার হাতে। কুহুর কাছে ফেরা হয়নি আর। স্নেহা সুদীপ্তর সন্তান নয় সুদীপ্ত সেটা জেনেছে। এখন এক ছাদের তলায় প্রায় কুড়ি বছর ধরে সংসার করছে তারা কিন্তু দুজনের মাঝে স্বামী-স্ত্রীর সুসম্পর্ক গড়ে উঠেনি। সুমিত্রা কে সে শুধুই ঘৃণা করে। সুমিত্রার জন্য সেদিন তার ভালোবাসা পাগলী কুহুকে হারিয়েছে। কোনোদিনও ক্ষমা করতে পারবে না সুমিত্রাকে, কোনোদিনও না। সুদীপ্তর ভাবের ঘোর কাটতেই সুমিত্রা তার ঝাঁঝালো কণ্ঠস্বর নিয়ে বলে উঠল...

—আমি যাচ্ছি।

—হুঁ।

—পার্টি থেকে ফিরতে রাত হবে, ওই বাড়িতে যাবো।

—হুঁ।

সুমিত্রা চিৎকার করে বলল,

—হুঁ-হুঁ কি করছে। একটা কাওয়ারড।

—হুঁ।

—সুমিত্রা এবার নিজেকে ধরে রাখতে পারল না। তার প্রতি সুদীপ্তর এই উদাসীনতা তাকে কষ্ট দেয় না, স্বয়ং হেরে যাওয়ার অনুভব করায়। পঁয়তাল্লিশ বছরেই সুদীপ্তর চুল দাড়ি সাদা হয়ে গেছে, চোখে মুখে বলিরেখার ছাপ স্পষ্ট। কিন্তু সুমিত্রা এই চল্লিশ বছরেও টানটান চেহারা ধরে রেখেছে, চিবুকের নীচে হালকা মেদ জমলেও এই বয়েসে সে এখনও যেন অষ্টাদশী। নিয়মিত শরীরচর্চা করে। সুদীপ্ত এখন ঠিক করে তার মুখের দিকেও তাকায় না। অথচ একদিন এই সুমিত্রার জন্যই সুদীপ্ত মরতেও রাজি ছিল। না! আত্মবিশ্বাসী সুমিত্রা হার মানার পাত্রী নয়। যতোদিন জীবিত থাকবে সুদীপ্ত তাকে তিলে তিলে শেষ করে দেবে। এখনও প্রচুর ছেলে বন্ধু আছে সুমিত্রার, তারা সকলে সুমিত্রার রূপে বশ হয়, কিন্তু সুদীপ্ত। বিয়ের পর সুদীপ্ত তাকে সব দিয়েছে, টাকা-পয়সা সব, কিন্তু একদিনের জন্যও তার শরীরটিকে স্পর্শ করে দেখেনি। ঘেন্না করে তাকে, এই সত্য সুমিত্রা মানতে পারবে না। তাই সুমিত্রাও দিনের পর দিন অন্য পুরুষের সান্নিধ্যে এসে সুখ খুঁজছে এখনও খুঁজে চলছে কিন্তু কোথাও যেন একটা অপ্রাপ্তি তাকে গ্রাস করে চলছে। কুহুর জন্য সুদীপ্ত অপেক্ষায় থাকে এই সত্য সুমিত্রাকে আরও পরাজয়ের কাছে নিয়ে যায়। সুমিত্রা হার মানার পাত্রী নয়, সুদীপ্তর ওপর শুধু তার অধিকার। সুদীপ্তর শরীর, মন সব তার। তার ছাড়া আর কারও নয়...

...সুমিত্রা রাগে-ক্ষোভে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

সুদীপ্ত একটু যেন হাসলো। সুমিত্রার অভাব সে বোঝে। যৌবনের দিনগুলিতে যখন সুদীপ্তর বুকের ওপর মাথা রাখতে চাইলো সুমিত্রা, সুদীপ্ত তাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। ঘেন্না করে সে সুমিত্রাকে। রাতের পর রাত উপোস করে কাটিয়েছে সুমিত্রা। সুদীপ্ত কাপুরুষ হলেও এই জায়গায় সে বীরপুরুষ হয়ে উঠেছিল। আগুনের কাছে থাকলেও নিজেকে সংযত করতে পেরেছে। তারপর একদিন সুমিত্রার মাঝে দেওয়াল তুলে রুমে পরিবর্তন করে নেয় সুদীপ্ত। কুহু তাকে যে সুখ দিয়েছে সেই ভালোবাসা মিশ্রিত সুখ সুদীপ্তর শরীরকে এখনও উত্তাপ দেয়। কুহুর প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ সুদীপ্ত নিতে পেরেছে। সুমিত্রা আজ হাতড়ে বেড়াচ্ছে প্রকৃত সুখ যা কখনওই পাবে না। সুমিত্রা তিলতিল করে মরবে। সুদীপ্তর ভালোবাসা শরীর কিছুতেই তার অধিকার নেই।

সুদীপ্তর চোখের কোণে চিকচিক করে উঠলো জল। কহুদের বাড়ির ছাদের দিকে তাকালো সে— চিলেকোঠাটা আজ শূন্যতায় ভরে গেছে। কুহুর গান আর শোনা যায় না। কথাগুলো মনে করেই যেন সুদীপ্তর বুকের বাম দিকটা একটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভিতর থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো পাগলীটা আজ কোথায় আছে! কি করেছে? কে জানে...

প্রতিশোধ

অম্বিকা গুহরায়

যোগমায়া দেবী মনে মনে ভাবলেন, তোমরা যে আসবে বাবা এ আমি জানতাম। তোমাদের যে আসতেই হবে। এতগুলে টাকার মায়া কি ছাড়া যায়। এই দিনটার অপেক্ষাতেই তো আমি আছি। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যোগমায়া মনের ভাবটা গোপন করার চেষ্টা করলেন।

—অত সাতপাঁচ কি ভাবছ মাসি। তোমার ঐ জরাজীর্ণ বাড়ি এত টাকায় কেউ কিনবে না। নেহাত নতুন ব্যবসায় নামছি, একটা জায়গা দরকার। তাই তোমার কাছে আসা। উদাস মাসির দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলল নাসির।

—না, বাবারা। আমি চার লাখ টাকার এক পয়সা কমে এবাড়ি বেচবো না। তোমরা এ দাম দেবে তো দাও, নইলে পথ দেখো।

নাসির একবার কেলোর দিকে তাকায়। ভাবটা কি করা যায় বলত, এমন। কেলো বলে,—তোমার এবাড়ি দু'লাখ টাকাও দাম হবে না। আর তুমি চার লখ টাকা দাম হেঁকে বসে আছো। আমরা তিন লাখ দিতে রাজি। এইবেলা এই দামে ছাড়ো। নইলে দু'লাখও তোমায় কেউ পুঁছবে না।

যোগমায়া দেবী চোয়াল শক্ত করে দৃঢ় কণ্ঠে বললেন,—কেন মিছে কথা বাড়াচ্ছো তোমরা। আমার ঐ এক কথা। বেলা বাড়ছে, আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। এখন তোমরা যাও।

বলেই দাওয়া থেকে উঠে পড়লেন যোগমায়া দেবী। অগত্যা নাসির ও কেলোকেও উঠতে হল। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবলো তারা। দূরে সরে গিয়ে ফিসফিসিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তারপর যোগমায়ার কাছে এসে নাসির বলল,—ঠিক আছে। আমরা চার লাখ দিয়েই তোমার এবাড়ি নেব। নেহাত দায়ে পড়ে আছি। আচ্ছা, আজ চলি, কাল আমরা টাকা নিয়ে আসব।

যোগমায়া দেবীর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা খেলে গেল। বাড়ি বেচবার উপযুক্ত লোক এতদিনে পাওয়া গেল। বহু লোক বাড়ি কিনতে এসে দাম শুনে চোখ কপালে তুলে চলে গেছে। পাড়া-প্রতিবেশীরাও বলেছে, তুমি যে দাম হেঁকেছ যোগমায়া, তাতে কোনদিনই তোমার পর্ণকুটীর বেচতে পারবে না। আর কাশী যখন যাবে, তখন তোমার টাকার কিসে এত দরকার। যা দাম পাও সেই দামে বেচে দাও।

তবু যোগমায়া রাজি হননি। তার স্থির বিশ্বাস ছিল একদিন সে আসবে, যে বাড়িটার প্রকৃত মূল্য দেবে। দীর্ঘ দুবছরের বেশি যে অপেক্ষা করে সে আছে। এতদিনে বুঝি সেইদিন এল।

হাঁড়িতে ভাত টগবগ করে ফুটছে। তারই ধোঁয়া যোগামায়া দেবীর চোখের উপর যেন এক মায়াজাল সৃষ্টি করেছে। তিনবছর আগের এক বিভীষিকা রাতের কথা চিন্তা করে শরীরটা তার শিউরে উঠছে।

কালীপুজোর রাত ছিল সেটা। ঘোর অমাবস্যা। কিছুক্ষণ আগে পুজো সেরে বাড়ি ফিরেছেন যোগমায়া। রাত প্রায় একটাই হবে। পল্টু খেয়েদেয়ে মাটিতে মাদুর পেতে ঘুমোচ্ছে। বিধবাব

একমাত্র সন্তান। স্বামী যখন মারা যায় পল্টুর তখন ন'বছর। অত্যধিক স্নেহের বশে পল্টুকে কোনদিন শাসন করতে পারেননি যোগমায়া। ফলে পল্টু হয়ে উঠল একরোখা, জেদী, বেপরোয়া একটি ছেলে। প্রতিবেশীরাও তার জ্বালায় অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। কয়েকবার তো এমন অবস্থা হল যে সবাই মিলে পল্টুর নামে পুলিশে নালিশ করতে যাচ্ছিল। যোগমায়া হাতে-পায়ে ধরে রক্ষা করেছেন। সেখানে সেখানে মারামারি করে আসত। হাতে-পায়ে মুখে অসংখ্য কাটাফাটার চিহ্ন। মা হয়ে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন যোগমায়া। বারবার ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। পল্টুকে কিছু বলতে গেলেই মুখ ঝামটা দিয়ে ওঠে—মেলা ফ্যাঁচফ্যাঁচ কোরো না তো। কাজ করে দুমুঠো অন্ন জোগাড় করতেই জীবন কেটে যাবে। দাঁও মারতে হবে বুঝলে। বড়লোক হতে হবে, বড়লোক।

ছেলের কথার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারেন না যোগমায়া। শুধু বুঝতে পারেন ছেলেটা কেমন দিন দিন তার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। শক্ত সমর্থ জোয়ান ছেলে তার। অসৎ সঙ্গে পড়ে কোনদিন কিছুনা ঘটিয়ে বসে।

ঘটালোও তাই। পল্টু ডাকাতি করেছে। পাঁচিল টপকে ঘরে ঢুকেছিল পল্টু। একটা শব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল যোগমায়া। দেখে পল্টু সামনে দাঁড়িয়ে আছে। মুখ কালো কাপড়ে ঢাকা, কাঁধে একটা ব্যাগ। মা'কে দেখেই পল্টু বলেছিল, তুই আবার বেরিয়ে এলি কেন? যা গিয়ে শুয়ে পড়।

পল্টুর চাপা কণ্ঠস্বর আর চোখমুখে কেমন একটা অস্বাভাবিক ভাব দেখেই যোগমায়া বুঝতে পেরেছে, কিছু একটা ঘটিয়ে এসেছে পল্টু।

—ওটা কার ব্যাগ?

–বন্ধুরা রাখতে দিয়েছে।

—কি আছে ব্যাগে?

—তোর জেনে কি হবে? এখন সরতো, আমার এখন অনেক কাজ আছে।

বলে মাকে জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে শিকল তুলে দিয়েছিল বাইরে থেকে।

একঘণ্টা পর শিকল খুলে ঘরে এসেছিল পল্টু। অন্ধকারের মধ্যেও যোগমায়া দেখেছে, পল্টুর কাঁধে ব্যাগটা নেই।

বিড়ি খাওয়ার নাম করে পল্টু দেশলাই জ্বালাতেই যোগমায়া চোখ বুজে নিয়েছে।

ঘুমের ভান করে মটকা মেরে থেকেছে। ছেলেকে বুঝতে দিতে চায়নি যে সব সে দেখেছে।

দুদিন পর ছিল কালীপুজোর সেই বিভীষিকার রাত। মুখে একটু প্রসাদ দিয়ে জল খেয়ে যোগমায়া পল্টুর পাশে শুয়ে পরে।

আধঘণ্টা টাক গিয়েছে। হঠাৎ দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ। যোগমায়া উঠতে যাবেন, পল্টু বলে উঠল, তোর উঠে কাজ নেই। আমি দেখছি। বেরুবার সময় বাইরে থেকে শিকল তুলে ঘর বন্ধ করে দেয়।

শুয়ে শুয়েই যোগমায়া বুঝতে পারেন কারা যেন এসেছে। ফিসফিস করে তারা কথা বলছে পল্টুর সঙ্গে। তাদের কথা শোনবার জন্য যোগমায়া বিছানা ছেড়ে জানলার পাশে এসে দাঁড়ান। দুজন লোক। ঘোর অন্ধকারে ভালো করে ঠাওর করা যাচ্ছে না।

একজন বলল, টাকা কোথায় রেখেছিস?

আছে এক গোপন জায়গায়, পল্টুর উত্তর।

যা নিয়ে আয়।

আগে বখরা হোক।

কিছুক্ষণ চুপচাপের পর একজন বলে উঠল, আচ্ছা, এটা তোর প্রথম কাজ। তুই পাবি দুই লাখ আর আমরা পাব চার লাখ করে।

কেন? একসঙ্গে কাজ করেছি। বখরা সমান হবে। পল্টুর গলায় উত্তেজনা।

এবার অপর লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, পল্টু বেশি বাড়াবাড়ি করিস না। যা দিচ্ছি তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাক। তোকে দলে নিয়েছি এই তোর ভাগ্যি।

পল্টুও দমবার পাত্র নয়। বলল, ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়লে আমার কি কম শাস্তি হত? বখরা হবে সমান সমান তবেই টাকা বের করব।

পল্টু বলে চিৎকার করে একজন তার গালে একটা চড় কষিয়ে দিল। এবার গর্জে উঠল পল্টু— নাসির, আমারও গায়ের জোর আছে।

এরপর একটা ধ্বস্তাধস্তির শব্দ পায়। যোগমায়া তাড়াতাড়ি করে দরজা খুলতে যান। কিন্তু দরজা তো বাইরে থেকে বন্ধ। তাই জানলার সামনে আবার ফিরে আসেন। চিৎকার করে লোক জড়ো করবেন কিনা ভাবছেন। এমন সময় বিদ্যুৎতের ঝলকের মতো দুটো আগুনের কণা মুহূর্তে জ্বলে উঠল—গুড়ুম, গুড়ুম। একটা আর্তনাদ করে পল্টু পড়ে গেল মাটিতে। যোগমায়ার যেন সমস্ত পৃথিবীটা টলছে। শুধু মূর্ছা যাওয়ার আগে শুনতে পেলেন, কেলো, চল পালাই। কালীপুজোর রাত বলে অনেকেই তখনও জেগে ছিল। ছুটে এসেছিল পাড়া প্রতিবেশীরা যোগমায়ার উঠোনে। হ্যারিকেনের আলোয়

আবিষ্কার করেছিল পল্টুর নিথর দেহটা। দরজা খুলে যোগমায়ার চেতনা ফিরিয়ে আনেন তারাই। কি হয়েছিল ? জিজ্ঞাসা করাতে যোগমায়া বোবামুখে ফ্যালফ্যাল করে সকলের দিকে তাকিয়ে ছিল। ভাতের ফ্যান গালতে গালতে যোগমায়া ভাবে সামনের মাসের আটাশে পল্টুর মৃত্যুর তিনবছর হবে। তার একমাত্র ছেলে পল্টু। হোক মন্দ, তবু তো গর্ভে ধারণ করেছেন। চোখের সামনে ছেলেকে ওরকম ছটফট করে মরতে দেখে খুবই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলেন। প্রথম প্রথম একলা বাড়িতে কিছুতেই মন লাগত না। তারপর ধীরে ধীরে নিজেকে শক্ত করলেন। প্রতিশোধ নিতে হবে। ছেলের হত্যাকারীকে যতখন না নিজে হাতে শাস্তি দিতে পারছেন, ততক্ষণ তিনি শান্তি পাবেন না। বাড়িরই কোথাও পোঁতা আছে দশলাখ টাকা। প্ল্যান করলে বাড়ি বিক্রি করবেন। চার লাখ টাকায়। যে বাড়ির দাম দুলাখ টাকাও হবে কিনা সন্দেহ, তার দাম রাখলেন চার লাখ। সবাই ভাবল যোগমায়া দেবী পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু তার স্থির বিশ্বাস ছিল এই জীর্ণ বাড়ি অধিক মূল্য দিয়ে কেউ একদিন কিনতে আসবে। যারা জানে এই বাড়ির মূল্য দশলাখ টাকার বেশি। সেই দিনটাই যে এসে গেছে। প্রতিশোধের একটা ক্রুর হাসি খেলে গেল যোগমায়ার মুখে।

পরদিন এগারোটার সময় এসে গেল ক্রেতারা। কেলো বলল, কাগজপত্র, টাকা পয়সা সব রেডি। সইসাবুদ করে টাকা নিয়ে এবাড়ি আমাদের হাতে তুলে দাও।

শান্ত কণ্ঠে যোগমায়া বললেন, এত তাড়া কিসের বাছারা। আজ থেকে এবাড়ি তো তোমাদেরই। বারবেলায় গৃহস্থের বাড়ি এসেছো। দুটো মুখে না দিলে যে অকল্যাণ হবে।

খাওয়ার কথায় নাসির, কেলো দুজনেই রাজি হয়ে যায়। যোগমায়া দুজনকে পঞ্চব্যঞ্জন সাজিয়ে খেতে দেন। চমৎকার রান্না। এমন খাবার অনেকদিন এদের কপালে জোটেনি। পেট পুরে খেয়ে তৃপ্তির ঢেঁকুর তোলে তারা।

এবার তোমরা একটু গাড়িয়ে নাও বাছারা। আমি স্নান সেরে পুজো করেই তোমাদের সবকিছু মিটিয়ে দেব।

ঘরের বাইরে এসে শিকল তুলে বাইরে থেকে ঘরটা বন্ধ করে দেন যোগমায়া। আর কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই তার প্রতিশোধের পালা পূর্ণ হবে। তিনি যে খাবারের মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলেন।

তীব্র বিষে গলা-বুক জ্বালা করতে শুরু করেছে নাসির, কেলোর। চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেড়িয়ে আসতে চাইছে। মাসিমা, মাসিমা বলে চিৎকার করে দরজা ধাক্কাচ্ছে। তারপর যে ক্ষমতাও তাদের নেই। তীব্র বিষের জ্বালায় মাটিতে পড়ে ছটফট করছে তারা। যোগমায়া বাইরে থেকে তাড়িয়ে তাড়িয়ে তা উপভোগ করছেন। একটু পরেই ওরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। যাক্, এতদিনে ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া গেল।

ধীরে ধীরে উঠে স্নান ঘরে গেলেন যোগমায়া। বেলা যে পড়ে এল, এখনও ঠাকুরকে জল দেওয়া হয়নি।

"১৯ শতকের একটি কিংবদন্তী অনুসারে"

একদিন সত্য ও মিথ্যার সাক্ষাৎ হল। মিথ্যা সত্যকে বলল, 'আজ দিনটা বড়ই সুন্দর।' সত্য আকাশের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবল দিনটা আসলে খুবই সুন্দর। তারা একসঙ্গে অনেকটা সময় কাটানোর পর অবশেষে একটা কুয়োর পাশে এল। মিথ্যা সত্যকে বলল, 'দেখ, জলটা কি ভালো ? চল একসঙ্গে চান করা যাক।' মনে আবারও সন্দেহ নিয়ে সত্য জলটা পরীক্ষা করে দেখল যে আসলে সেটা খুব ভালো। জামাকাপড় খুলে রেখে তারা স্নান করতে লাগল। হঠাৎই মিথ্যা জল থেকে উঠে এসে সত্যর পোশাক পরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। সত্য তো আর মিথ্যার পোশাক পড়তে পারে না। তাই সত্য প্রচণ্ড রেগে জল থেকে উঠে এল আর সব জায়গায় ছুটে ছুটে মিথ্যাকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। সে তার পোশাক ফিরে পেতে চাইছিল। সত্যকে নগ্ন দেখে সারা পৃথিবী ঘৃণা আর রাগে তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল। বেচারা সত্য দুঃখিত মনে কুয়োর কাছে ফিরে এল তার নিজের লজ্জা ঢাকার জন্য। চিরতরে সেই কুয়োর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে লুকিয়ে রইল।

সেই থেকে সত্যের পোশাক পরে মিথ্যা সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর সমাজের চাহিদা পূরণ করে চলেছে। কারণ, এমনিতেও নগ্ন সত্যের মুখোমুখি হওয়ার কোন ইচ্ছা পৃথিবীতে নেই।

দিগন্তরেখা

সমীর গুহরায়

আকাশের মেঘ যখন রাঙা হয়ে ওঠে, ধবল বকের সারি উড়ে চলে গৃহের টানে, যখন আকাশে ফুটে ওঠে সন্ধ্যাতারা তখন আশালতার দুফোঁটা চোখের জল গিয়ে পড়ে তুলসীমঞ্চে। দিগন্তের ওপারে নিজের বাড়িঘরের কথা মনে পড়লে বুকটা হাহাকার করে ওঠে আজো। আটচালার মাঝে প্রশস্ত উঠোন। তারই মাঝে ছিল তুলসীমঞ্চ। তারই পাশে লাউমাচাটা। মঞ্চের বাঁদিকে, একটু তফাতে দুটো ধানের গোলা। কি সুন্দর আল্পনা দিয়ে বাড়িটাকে সাজিয়ে ছিল আশালতা। আম, কাঁঠাল, শিউলি আর শটিবন দিয়ে ঘেরা চারদিক। সব মনে আছে আশালতার। ওরা কি রেখেছে তুলসী মঞ্চটা। নাকি হিন্দুয়ানীর চিহ্ন বলে উপড়ে ফেলে দিয়েছে। পরিবারে দুর্দিন এসেছে, আবার সুদিনে সকলে মেতেছে আনন্দে। হাসিকান্নার দোলায় জীবনের পটপরিবর্তন হয়েছে। কিন্তু দিনান্তের শেষে সূর্য অস্ত গেলে, গা' ধুয়ে পাট ভাঙা শাড়ি পরে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতে আশালতার একদিনও ছেদ পড়েনি। আজও—অস্তমিত সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে লাল আবিরের ছটা লাগিয়ে দেয়, আশালতা দুচোখের জলে প্রদীপ জ্বালে তুলসীমঞ্চে। ভুলতে পারেনি সে কিছুই, ভোলা যায়নি।

যেমন ভোলা যায়নি সেই ভয়ঙ্কর রাতের স্মৃতি। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের আড়াল থেকে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছিল উঠোনে। ফিসফিসানি অনেকগুলো মানুষের কথা শুনে দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছিল দিবাকরের বাবা।

ডাকাবুকো লোক। তেমনি দরাজ মন ছিল। তার জমিতেই কাজ করে তো পেট চলে খাঁ-পাড়ার লোকগুলোর। প্রকৃতির রোষে কতবার উজার হয়ে গেছে খেতের ফসল। তবু গরীব মানুষগুলোকে একদিনের জন্য উপোসে থাকতে হয়নি। স্বাধীনতার লড়াই লড়ছে মুক্তি সেনারা। এদের প্রতি সমর্থন আছে প্রভাকর রায়ের। লুকিয়ে লুকিয়ে তাদের কতবার চাল-ডাল-তেল-নুন-অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে সে। আশালতা কতবার সাবধান করেছে, 'ছোট ছোট পোলাপান নিয়ে সংসার। তুমি কেন এসবের মধ্যে যাও।' ডর কিসের? মুক্তি আইব। দ্যাশ স্বাধীন হইব। ঐ খানসেনারা আমাগো দ্যাশটারে পিষসে। এবার সামনাসামনি যুঝে নিতে হবে। ডর কিসে। আমাগো প্রতিবেশিরা সঙ্গে আছে না। দরজা খুলে দেখে উঠোনে বিশ-পঁচিশজন লোক। কেডা রে—

কোন সাড়া নেই। তারপর নিমেষে ঝলসে উঠেছিল, তলোয়ার, চাপাতিগুলো। হিংস্র পশুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আট-দশজন। এলোপাথারি কোপাতে লাগল স্বামীকে। ঘরের ভিতর থেকে সব দেখেছে আশালতা। ছোট্ট ময়নাকে বুকে ধরে আর আট বছরের দিবাকরকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে সব দেখেছে। প্রাণ বেরুবার আগে প্রভাকর বলেছিল, 'ওসমান, নাজির, মইদুল, সিরাজ—তোরা এটা করতে পারলি?'

'হ, পাইরল্যাম কর্তা। মৌলবী সাহেব বলেছে, কাফেরের সঙ্গ আল্লা রসুলের পছন্দ নয়। তার আদেশে জিহাদ করতেছি কর্তা।'

'আর এতদিন যে তোদের খাইয়ে পরিয়ে রাখলাম। এতটুকু মানবিকতা—' কণ্ঠ ক্ষীণ হয়ে আসে প্রভাকরের।'

ওটাই তো আমাগো ধম্মে নেই কর্তা।

আর শুনতে পারেনি আশালতা। এবার তাদের পালা। খিড়কির দোর খুলে নিঃশব্দে দিবাকরের হাত ধরে বেরিয়ে পড়ে আশালতা। ময়নার মুখটা হাত দিয়ে চেপে রেখেছে।

মা, বাবা—আতঙ্কিত দিবাকর চাপাস্বরে বলে।

চুপ। একটা কথা বলবি তো তোকে আমিই শেষ করে দেব।

তারপর ছেলের হাত ধরে, মেয়ে কোলে নিয়ে দৌড় দৌড় দৌড়। বনবাদাড় ভেঙে, খাল-বিলের আলপথ ধরে, পীরপুরের মোটর চলার রাস্তাটাকে পিছনে ফেলে সে এক অন্তহীন ছুট।

ছেলেটা বারে বারে পিছিয়ে পড়ছে। 'মাগো আর পারছি না।'

আশালতাই কি পারত? আজ যেন দৈবশক্তি ভর করেছে তাকে। ছেলেমেয়েগুলোকেও যে ওরা ছাড়বে না। আর তার নারীমাংস ছিঁড়ে খেতে হিংস্র দাঁত-নোখ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে বাচ্চা থেকে বুড়ো। এযে গণিমতের মাল—সকলের সমান অধিকার। প্রাণ কতক্ষণ শরীরে আছে ততক্ষণ ভোগ করে যাও। ছেলেমেয়ের প্রাণ আর নিজের ইজ্জত বাঁচাতে মরণপণ দৌড় লাগিয়ে ছিল আশালতা। শেষে এসে মুখ থুবড়ে পরেছিল দিগন্তের এপারে। বিদেশ বিভুঁই হলেও মানুষগুলো আশ্রয় দিয়েছিল তাকে। উত্তর ২৪ পরগণার দেগঙ্গায় দরমা-হোগলা দিয়ে ছাওয়া এতটুকু একটা আশ্রয়ও মিলে গেল তার। পাঁচবাড়ির কাজ করে আর সরকারের দেওয়া সেলাই মেশিন থেকে যা আয় তাই দিয়ে মানুষ করতে লাগল দিবাকর-ময়নাকে। পড়াশুনো শিখে তারা এখন বড় হয়েছে। ময়নার বিয়ে হয়েছে দত্তপুকুরে এক রেল কেরাণীর সঙ্গে। দিবাকর স্কুলমাস্টার। পার্টি নাকি তাকে চাকরি দিয়েছে। দোতলা বাড়ি।

ছেলে এখন কোন এক সমাজতন্ত্রী দলের নেতা। কত মুসলমান তার বন্ধু। তাদের মাঝে মাঝে বাড়িতেও নিয়ে আসে দিবাকর। একদিন আশালতা ছেলেকে বলেছিল—সব কি ভুলে গিয়েছিস খোকা?

'মা, সময় বদলে গিয়েছে। তুমি সেই পুরানো কাঁসুন্দি এখনও ঘেঁটে চলেছে। আমরা যেই দল করি সেখানে জাত-পাত, সম্প্রদায় কিছুই নেই। মানুষই বড়। মানবিকতাই বড়।' বলেছিল দিবাকর।

মানবিকতা! শব্দটা শুনেই শিউরে উঠেছিল আশালতা। মনে পড়ে গেল বহু বছর আগে শোনা এক কর্কশ কণ্ঠস্বর—'ওটাই তো আমাগো ধম্মে নেই কর্তা।'

কি করে তোকে বোঝায় খোকা, সময় বদলায়, বদলা না ওদের মানসিকতা। ওত পেতে শিকারির মতো ওরা অপেক্ষা করে থাকে। বছরের পর বছর। তারপর সুযোগ বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। 'জিহাদ করছি কর্তা, জিহাদ।' ওরা কোনোদিন বদলাবে না। আমরা শুধু ভুলে থাকতে চেয়ে সব কিছু ভুলে গেছি।

দিগন্তের ওপারে দুটো বড্ড প্রিয় জিনিস ফেলে এসেছে আশালতা। স্বামীর বুক চেরা নিথর শরীর আর তুলসীমঞ্চ। খুব ইচ্ছা করে একবার সেই উঠোনে গিয়ে দাঁড়াতে। স্বামীর রক্তে ভেজা মাটি একবার মাথায় ঠেকাতে। সূর্য পশ্চিমপাটে ঢলে পড়লে শাঁখ বাজিয়ে তুলসীমঞ্চে প্রদীপ জ্বালাতে। কিন্তু বড্ড ভয় হয়। গণিমতের মালের যে কোন বয়স হয়না। মানবিকতা? ওটাই তো আমাগো ধম্মে নেই কর্তা।

"যে বাণী একদিন সরস্বতীতীরে ঋষিগণের নিকট প্রকাশিত হইয়াছিল, যাহার প্রতিধ্বনি নগরাজ হিমালয়ের চূড়ায় চূড়ায় প্রতিধ্বনিত হইতে হইতে কৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের ভিতর দিয়া সমতল প্রদেশে নামিয়া সমগ্র দেশ প্লাবিত করিয়াছিল, তাহাই আবার উচ্চারিত হইয়াছে। আবার দ্বার উদঘাটিত হইয়াছে; সকলে আলোর রাজ্যে প্রবেশ করুন -দ্বার আবার উদঘাটিত হইয়াছে।"

আজকের সরস্বতী

মিতালি মুখার্জী

তেহট্টের সেই অগ্নিকন্যা
প্রিয়া বাগ নাম যার,
দুচোখ জুড়ে স্বপ্ন অনেক
বুকভরা হাহাকার।
দশম শ্রেণির ছাত্রী সে
করবে বিশ্বজয়,
সরল শ্যামল মুখখানি তার
চিত্ত যে নির্ভয়।
বিদ্যাদেবীর আরাধনায়
পড়লো বাধা যেই,
স্ফুলিঙ্গ তার ছড়িয়ে গেল
পথের ধুলোতেই।
বক্ষে ধরে মায়ের মূর্তি
মাতৃ পূজার পণ,
সেই পাপে তার ঘটল এমন
নিঠুর, নির্যাতন।
পথের ধুলো রক্তমাখা
রক্ত মেয়ের গায়ে
মাথা ফেটে ঝরছে রক্ত
লাঠি পড়ছে গায়ে।
হায়রে আমার দেশের মানুষ
হায়রে বাংলা মা,
অত্যাচারীর কোপের আগুন
কেউ থামাল না।
আমরা তবে কিসের স্বাধীন।
স্বাধীনতা কী তা?
দুঃশাসনের হাতে এবার
বালা নির্যাতিতা।
তোষণনীতির বেবাক ফাঁকে
বছর গেল চলে।
বিদ্যাদেবীর বরণমালা
প্রিয়া তোমার গলে।

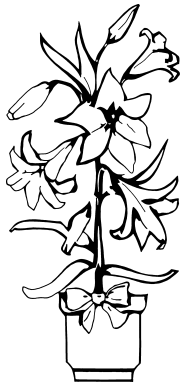

মা

মমতা ভট্টাচার্য্য

মা ডাকে আছে অনেক প্রেম, অনেক ভালোবাসা
মা ডাক ভরিয়ে দেয় অনেক স্নেহ-ভালোবাসা
মা আছে অন্তরে, মা আছে এই হৃদয়ে
মা বিরাজ করে আমার মনের মন্দিরে
সুন্দর সুজলা সুফলা এই মাতৃভূমি
তোমারই কারণে তার স্বাদ গ্রহণ করি
শত যন্ত্রণা শত কষ্ট সহ্য করে
দশমাস দশদিন গর্ভে ধারণ করে
আমার কান্না মাখা মুখ দেখে
নিজ কষ্ট ভুলে হাসলে তুমি মন প্রাণ খুলে
তুলে নিলে তোমার আদর মাখা কোলে
আজ আমি অনেক বড়, আছি হেলে খেলে
কষ্ট পেলে ছুটে যাই তোমারই ছায়াতলে
যেথায় যেমন থাকোনা কেন
মা গো, তুমি থাকো আমার অন্তরে।।

অসুরনাশী

দেব চট্টোপাধ্যায়

পারবি কি তুই শহর ছেড়ে,
বাংলা মায়ের গাঁয়ের পথে
সনাতনীর গরীব কুঠি
মাটির দালান, তুলসি গাছে,
জিহাদ কালো মেঘের নজর
ছিনিয়ে নিতে?

পারবি কি তুই?
বিছিয়ে দিতে, লক্ষ্মী আসন,
বিদ্যামন্ত্র সরস্বতী?

পারবি কি তুই?
মিলিয়ে দিতে,
ডাকাতরানী চৌধুরানী,
দেবীমন্ত্র, দশভুজা

খবর রাখিস,
বাংলার সেই গাঁয়ের মেয়ে
গণিমতের ভোগ্যপণ্য?
দ্যাখ চেয়ে
ওই উঠল নেয়ে।
আদুল গায়ে, মায়ের মাটি,
রক্ত চক্ষু অগ্নিকন্যা
হিংস্র মুখে অট্টহাসি
খড়্গ হাতে আসছে ধেয়ে
অসুরনাশী।

পারবি কি তুই?
শাক্তভূমির শক্তি হয়ে
ছড়িয়ে যেতে?

মানানসই

মীনাক্ষী দাস

তুমি বললে পাহাড় কিনে দেবে—
আমি বললাম—'কিসের প্রয়োজনে?
একটা পাথর কুড়িয়ে আনো যদি,
সাজিয়ে রাখব ঠাকুর সিংহাসনে...'

হঠাৎ তোমার বাগান কেনার শখ...
শুনে বললাম...'খরচ কোরো বুঝে
একটা বরং গোলাপ কিনে এনে
নিজে হাতে খোঁপায় দিও গুঁজে...'

সেদিন বললে বিদেশ নিয়ে যাবে—
হেসে বললাম...'অর্থ অপচয়,
তার চেয়ে চলো দুজন মিলে বসে
নদীর পারে দেখবো সূর্যোদয়...'

জীবন হল ছোট্ট ডিঙির মতো
কি হবে তার মস্ত বড় পাল?
ঝড়-জল সব সামাল দিতে গেলে,
চাই তো মোটে শক্ত দুটো হাল...'

আমরা হলাম মাটির কাছের জীব,
সারা জীবন মাটির মাপেই রই...
চাওয়া পাওয়া ছোট্ট হবে যত
জীবন তত হবে মানানসই।

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার অব্যাহত

বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। হিন্দুর মঠ-মন্দির ধ্বংস, জমি-বাড়ি দখল, দোকানপাট লুঠ আজ যে দেশে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সঙ্গে চলছে হিন্দু নারী ধর্ষণ ও লাভ জেহাদের ফাঁদে ফেলে হিন্দু মেয়েদের ধর্মান্তরকরণ। সংখ্যালঘুদের ক্রন্দনে আজ বাংলাদেশের আকাশ-বাতাস মুখরিত। অথচ পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু সমাজ নীরব। এই অত্যাচারের এতটুকু প্রতিবাদ করতে কাউকে দেখা যায়নি। হিন্দু সংহতি কিন্তু চুপ করে থাকেনি। লাগাতারা এর প্রতিবাদ চালিয়ে গিয়েছে। হিন্দু সংহতি এ ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চায়। সরকার ওই দেশের সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার নিবারণে স্থায়ী সমাধানে সচেষ্ট হোক—হিন্দু সংহতির এই দাবি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রতিবাদ

ইসলামপুরের দাড়ভিট হাইস্কুলে বাংলার শিক্ষক চেয়ে প্রতিবাদ করে গুলিতে নিহত হল তিনজন স্কুল ছাত্র। কে বা কারা গুলি চালালো? কার নির্দেশে স্কুলছাত্রদের উপর গুলি চালানো হল? এই নৃশংস ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত চেয়ে হিন্দু সংহতি দোষীদের উপযুক্ত সাজার দাবি জানায় রাজ্য সরকারের কাছে। যতদিন না এই ঘটনার প্রকৃত দোষীরা ধরা পড়ছে এবং তাদের সাজা না হচ্ছে ততদিন হিন্দু সংহতি বিভিন্ন স্তরে তার প্রতিবাদ জানাতে থাকবে।

PRINTER & PUBLISHER : CHITTARANJAN DEY,
PRINTED AT MAHAMAYA PRESS & BINDING, 23 Madan Mitra Lane, P.S. : Amherst Street, Kolkata - 700 006,
Published at : 230/3, Raipur Road, Police Station Netaji Nagar, Kolkata 700 047
Editor's Name & Address : Samir Guha Roy, 5, Bhuban Dhar Lane, Kolkata - 700 012, Phone : 7407818686/9836188899